ইতিহাস

ইতিহাস

[প্রাচীন যুগ]

ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাস। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত। টি. বি. সংখ্যা ৬ এইচ/৭৯/১৪০/তাং-৫.১২.৭৯

ইতিহাস

[প্রাচীন যুগ]

শ্রীনির্মলকুমার নন্দী এম. এ

হরফ প্রকাশনী

এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট । কলকাতা-৭। ৩৪-৫৫৬৩

প্রথম প্রকাশ :
মে, ১৯৭৯

প্রকাশনায় :
হরফ প্রকাশনী
এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭

মুদ্রণ :
আনন্দ প্রেস
৬ চিন্তামণি দাস লেন
কলকাতা-৭

মূল্য : পাঁচ টাকা

সূচীপত্র

॥ গ ॥ ইরান বা পারস্যের অভ্যুত্থান

॥ ঘ ॥ ইহুদীগণ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন গ্রীসদেশ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রোম

নবম পরিচ্ছেদ

চীনদেশ

দশম পরিচ্ছেদ

ভারত

প্রথম পরিচ্ছেদ

১. ইতিহাস পাঠের উপযোগিতা

অতীত কালের ধারাবাহিক বিবরণকেই বলে **ইতিহাস**। কিন্তু অতীত কালের ধারাবাহিক বিবরণ বা ইতিহাস জেনে আমাদের লাভ কি? মনে হতে পারে, শত শত, হাজার হাজার, এমন কি লাখ লাখ বছর আগে কি ঘটেছিল, তা জানা, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারব, অতীত কালের এইসব ধারাবাহিক বিবরণ বা ইতিহাস জানা আমাদের একান্তই দরকার।

এখন আমরা কতো সুন্দর সুন্দর বাড়িতে বাস করি, কতো সুস্বাদু খাদ্য-পানীয় খাই, কেমন সুন্দর ও আরামদায়ক পোশাক পরি। কতো স্বচ্ছন্দে, কতো স্বল্প সময়ে, কতো দূর দূর স্থানে চলে যাই। আমরা কতো লেখাপড়া শিখি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করি।

কিন্তু তা তো একদিনে ঘটেনি। এমন একদিন ছিল, যখন মানুষ গাছের ডালে ও পাহাড়ের গুহায় বাস করতো, ফলমূল কুড়িয়ে, জন্তু-জানোয়ার মেরে খেতো, উলঙ্গ থাকতো, পদে পদে হাজারো বিপদের সম্মুখীন হ'তো। মানুষ ছিল অসভ্য।

যুগ যুগ ধরে অসংখ্য মানুষের ক্রমাগত অবিরাম চেষ্টার ফলেই মানুষ আজ সভ্য হয়েছে। সভ্যতার একটি অবস্থা থেকে আর একটি অবস্থায় গিয়ে পৌঁচেছে। এইভাবে মানুষ এসেছে সভ্যতার বর্তমান অবস্থায়। এইভাবে চলছে মানব-সভ্যতার অবিরাম অগ্রগতি।

মানব-সভ্যতার এই অগ্রগতির ধারাকে বুঝবার জন্যই আমরা ইতিহাস পড়ি। এই সভ্যতার ধারা বুঝতে পারলে আমরা সভ্যতার পথে আরো অগ্রসর হতে পারি।

২. প্রাচীন কালের মানুষের কথা জানার উপায়

এখনকার ইতিহাস আমরা সমসাময়িক ব্যক্তিদের লেখা স্মৃতিকথা, ভ্রমণ-কাহিনী, জীবনী, সাহিত্য, ইতিহাস, সংবাদপত্র প্রভৃতি থেকে সহজেই জানতে পারি। মানুষ যখন থেকে ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি রচনা করতে শিখেছে, তখনকার কালের বিবরণ জানাও খুব কঠিন নয়। এখন থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে রচিত হয়েছিল আমাদের

দেশের ধর্মশাস্ত্র বেদ ; এখন থেকে আড়াই হাজার বছরেরও আগে রচিত হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য **ইলিয়াড ও ওডিসি** এবং পৃথিবীর প্রথম ঐতিহাসিক **হেরোডটাস**-রচিত ইতিহাস গ্রন্থ।

এইসব ধর্মগ্রন্থ, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি থেকে বিগত তিন হাজার বছর আগেকার বিবরণ বেশ কিছুটা জানা যায়। ঐ সময়কার অনেক কথা ঐ যুগের অনেক লিপি, অনুশাসন, সীলমোহর, মুদ্রা, ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি থেকেও জানা গেছে।

এখন থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেই মানুষ লিপির বা অক্ষরের ব্যবহার শিখেছিল। ঐসব লিপিতে তারা অনেক কিছুই লিখে রেখে গিয়েছিল। ঐসব অনেক লেখা এখন আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এইসব লেখা সম্পর্কে অসুবিধা হ'লো এই যে, ঐসব লিপি এখন পড়া বা পাঠোদ্ধার করা খুব সহজ নয়। তবে এইসব সুপ্রাচীন অক্ষর প'ড়ে সেগুলির পাঠোদ্ধার করবার জন্য পণ্ডিতরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন ও করছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা সফলও হয়েছেন। এই লিপি প'ড়ে পাঁচ-ছ হাজার বছর আগেকার মিশর ও মেসোপটেমিয়ার অনেক কথা জানা সম্ভব হয়েছে।

কাহিনী-কিংবদন্তী ও অনুমানের উপর ভিত্তি ক'রে এক-একটি অঞ্চলে মাইলের পর মাইল খননকার্য চালানো হয়েছে। এইভাবে ভূগর্ভ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে সুপ্রাচীন কালের কতো নগর, প্রাসাদ, মন্দির, সমাধি প্রভৃতির চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ। আবিষ্কৃত হয়েছে সুপ্রাচীন সভ্যতার হাজার হাজার নিদর্শন। কতো দেশেই এ ধরনের খননকার্য ও অনুসন্ধান চালানো হয়েছে ও হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। এইসব খননকার্যের ফলেই মিশর, মধ্য-প্রাচ্য, মধ্য-এশিয়া, সিন্ধু অঞ্চল প্রভৃতি স্থানের সুপ্রাচীন মানুষ ও মানব-সভ্যতার অনেক কথাই জানা গেছে।

এই তো গেল বিগত পাঁচ-ছ হাজার বছর আগেকার মানুষের কথা জানার উপায়ের কথা। কিন্তু পাঁচ-ছ হাজার বছর—সে তো মানব-ইতিহাসের অতি সামান্য অংশ—প্রায় একশ ভাগের এক ভাগ!

কয়েক লাখ বছর আগে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। তখন থেকেই তো মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করেছে। তাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে খাদ্য-পানীয়, করতে হয়েছে শীতাতপ, ঝড়-বৃষ্টি, কুয়াশা ও তুষারপাতের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য পরিচ্ছদ ও বাসের ব্যবস্থা। এক কথায়, তখন থেকেই সভ্যতার পথে মানুষের যাত্রা শুরু হয়েছে।

তাদের সম্বন্ধে জানবার জন্যও পণ্ডিতরা অবিরাম অক্লান্ত অনুসন্ধান চালিয়েছেন ও চালাচ্ছেন। মাটির তলায়, পাহাড়ের গুহায়, হ্রদের ধারে

তাদের সম্বন্ধে কতো কিছুই না আবিষ্কৃত হয়েছে! আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের দেহাবশেষ, তাদের অস্থি, করোটি, কঙ্কাল, তাদের তৈরি লাখো-লাখো পাথরের তৈরি হাতিয়ার, তাদের ভুক্তাবশেষের স্তূপীকৃত জঞ্জাল পর্যন্ত! আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের বাসস্থান ও সমাধির চিহ্ন, এমন কি পাহাড়ের গায়ে তাদের আঁকা ছবি! এসব থেকে এই কয়েক লাখ বছর আগেকার মানুষ সম্পর্কেও আমরা অনেক কথাই জানতে পেরেছি।

অনুশীলনী

১। ইতিহাস কাকে বলে?

২। ইতিহাস পড়ে লাভ কি?

৩। কয়েক লাখ বছর আগেকার প্রাচীন মানুষ সম্পর্কে কিভাবে জানা যায়?

৪। এখন থেকে তিন-চার হাজার বছর আগেকার প্রাচীন মানুষ সম্পর্কে কিভাবে জানা যায়?

৫। প্রাচীন মানুষ সম্বন্ধে জানতে কি কি জিনিস আমাদের সাহায্য করে?

৬। জীবাশ্ম কি? প্রাচীন লিপি বলতে কি বোঝ?

৭। হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের নাম কি?

৮। পৃথিবীর প্রথম দুটি মহাকাব্যের নাম কর।

৯। দুটি প্রাচীন সভ্যদেশের নাম লিখ।

১০। শূন্যস্থান পূরণ কর:

ক. পাঁচ হাজার বছর আগেই মানুষ — র ব্যবহার শিখেছিল।

খ. প্রাচীন লিপি পড়ে — বছর আগেকার — ও — অনেক কথা জানা সম্ভব হয়েছে।

গ. অনুমানের উপর ভিত্তি করে মাইলের পর মাইল — চালান হয়েছে।

১১। সঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন দাও:

ক. হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের নাম — ওডিসি, বেদ, বাইবেল।

খ. তিন হাজার বছরের সভ্যতার বিবরণ জানা যায় ঐ সময়কার — গাছ থেকে, মানুষ থেকে, ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্য থেকে।

গ. প্রাচীন সভ্যতা জানার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালাচ্ছেন, — পণ্ডিতরা, সাহিত্যিকরা, জ্যোতিষীরা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১. আদিম মানুষ

এখন থেকে প্রায় তিন লাখ বছর আগে বানর-জাতীয় কোনো প্রাণী থেকে ক্রমবিকাশের ফলে মানুষের জন্ম হয়েছিল। তারা যে ঠিক আমাদের মতো মানুষ ছিল, তা-ও নয়। ভূগর্ভ থেকে তাদের কিছু কিছু ফসিল বা জীবাশ্মপাওয়া গেছে—হাড়, মাথার খুলি প্রভৃতি। এইসব হাড়, মাথার খুলি প্রভৃতি জোড়া লাগিয়ে পণ্ডিতরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এদের কপাল ছিল ঢালু, চোয়াল ছিল বিরাট, ঘাড় প্রায় ছিলই না, মস্তিষ্ক ছিল খুবই ছোট। এদের মস্তিষ্ক বেশ ছোট হওয়ায় এরা প্রকৃত মানুষের মতো এতো বুদ্ধিমান ছিল না। এদের চোয়াল খুব বড় থাকায় সম্ভবত আমাদের মতো এদের বাক্‌শক্তিও ছিল না। এদের পায়ের হাড় থেকে বোঝা যায়, এরা সম্ভবত পা টেনে টেনে কিছুটা সামনে ঝুঁকে হাঁটতো।

একটি কল্পিত আদিম মানুষের চিত্র

এরা ঠিক আমাদের মতো মানুষ ছিল না। তাই এদের **প্রায়-মানুষ** বা **আদিম মানুষ** বলা হয়েছে। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে এইসব আদিম মানুষের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। তা থেকে বোঝা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানেই এদের উদ্ভব হয়েছিল।

এরা খাদ্যের জন্য গাছপালা থেকে ফলমূল, শস্য প্রভৃতি সংগ্রহ করতো এবং জন্তু-জানোয়ার, পাখী, মাছ প্রভৃতি শিকার করতো। এরা শীত, রোদ-

বৃষ্টি, ঝড়, তুষারপাত ও হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের হাত থেকে নিজেদে বাঁচাবার জন্য পাহাড়ের গুহায় বাস করত।

প্রায় তিন লাখ বছর আগেকার এই ধরনের আদিম মানুষের কিছু জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, চীন দেশের পিকিং শহরের কাছে একটি পাহাড়ের গুহায়। ঐ জীবাশ্মের সঙ্গে কিছু জন্তু-জানোয়ারের হাড় ও পাথরের হাতিয়ারও পাওয়া গেছে। তার চেয়েও বড় কথা হ'লো এই যে, ঐস হাড়ে রয়েছে আগুনে পোড়ানোর বা ঝলসানোর দাগ। তা থেকে বোঝা যায়, এরা আগুনের ব্যবহার জানত।

আগুনের ব্যবহার জানায় ওরা অন্ধকার, শীত ও হিংস্র জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষার কৌশল আয়ত্ত করেছিল।

২. পুরা-প্রস্তর যুগ

যদি তিন লাখ বছর আগে আদিম মানুষের আবির্ভাব ঘটে, তবে প্রথম আড়াই লাখ বছর তো তারাই এই পৃথিবীতে রাজত্ব করেছিল। তারপর পৃথিবীতে আবির্ভাব হয়েছিল আমাদের মত মানুষের—অর্থাৎ প্রকৃত মান ব জাতির। ঐ সব আদিম মানুষরা এবং প্রথম যুগের প্রকৃত মানুষরা প্রধানত কাঠ, হাড় ও পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করতো। আদিম মানুষের যে ন-দশটি দেহাবশেষ পাওয়া গেছে, সেগুলির সঙ্গে বা সেগুলির কাছে-পিঠে অসংখ্য পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। গোড়ার যুগের প্রকৃত মানুষের যেসব চিহ্ন পাওয়া গেছে, তার সঙ্গেও পাথরের হাতিয়ার বহু সংখ্যায় পাওয়া গেছে। তাই এই সুদীর্ঘ কালকে পণ্ডিতরা নাম দিয়েছেন **প্রস্তর যুগ**।

প্রস্তর যুগকে পণ্ডিতরা প্রধান দু'ভাগে ভাগ করেছেন—**পুরা প্রস্তর যুগ** ও **নব প্রস্তর যুগ**। গোড়ার আড়াই লাখ বছরে যেসময় পাথরের হাতিয়ারগুলি বড়, অমসৃণ ও ছিদ্রহীন ছিল, সেই যুগকে পণ্ডিতরা নাম দিয়েছেন **পুরা প্রস্তর যুগ**।
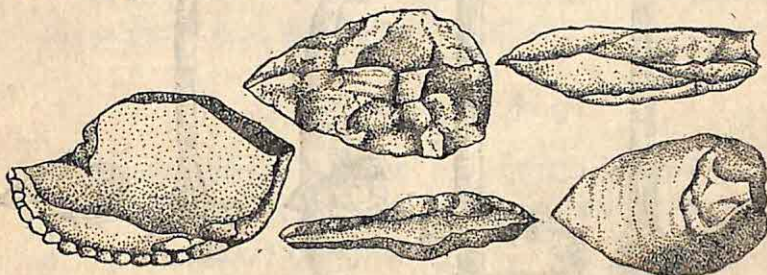
পুরা-প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও অস্ত্র

পুরা প্রস্তর যুগের এইসব পাথরের হাতিয়ার নানা কাজেই ব্যবহৃত

হ'তো। এর অনেকগুলি জোরে আঘাত ক'রে কাটার কাজে, অনেকগুলি মাটি খুঁড়বার কাজে, অনেকগুলি চেঁছে বা আঁচড়ে চামড়াদি পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত হ'তো ব'লে মনে হয়।

পুরা-প্রস্তর যুগের আদিম-মানুষরা ও খাঁটি মানুষরা এইসব হাতিয়ারের সাহায্যে শিকার করত, গাছের মূল ও কন্দ সংগ্রহ করতো। তারা জন্তু-জানোয়ারের চামড়া চেঁছে পরিষ্কার করতো। ঐসব চেঁছে-পরিষ্কার-করা চামড়া দিয়ে তারা পোশাক বানাতো, অনেক সময় তাদের বাসগৃহের ছাউনিও তৈরি করতো। তারা শীত ও ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য পাহাড়ের গুহায় বাস করতো। আগুন জেলে গুহা আলোকিত করতো। মাংসাদি খাদ্য আগুনে পুড়িয়ে বা ঝলসে খেতো। তাদের গুহার কাছে আদিম যুগের বিশাল লোমশ হাতীর হাড় দেখে মনে হয়, তারা দলবদ্ধভাবে বাস করত ও দলবদ্ধভাবে শিকার করত।

এরা চাষ-আবাদ ও পশুপালন জানত না। এরা বনের ফলমূল-শস্য সংগ্রহ করত এবং শিকার করত। বন থেকে সংগৃহীত ফলমূল-শস্য ও শিকারের দ্বারা সংগৃহীত মাংস ও মাছ ছিল এদের খাদ্য। তাই এরা ছিল খাদ্য-সংগ্রাহক।

৩. নব-প্রস্তর যুগ—ঐ যুগে হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির উন্নতি

প্রস্তর যুগের শেষভাগে মানুষ তাদের পাথরের হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রের অনেক উন্নতি করেছিল। তাদের পাথরের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি তখন বেশ মসৃণ হয়ে উঠেছিল। তারা পাথর ছিদ্র করার কৌশল উদ্ভাবন করেছিল। ফলে পাথরের হাতিয়ারে তারা কাঠের বা হাড়ের হাতল লাগাতে পেরেছিল। এক সময়ে যা পাথরের
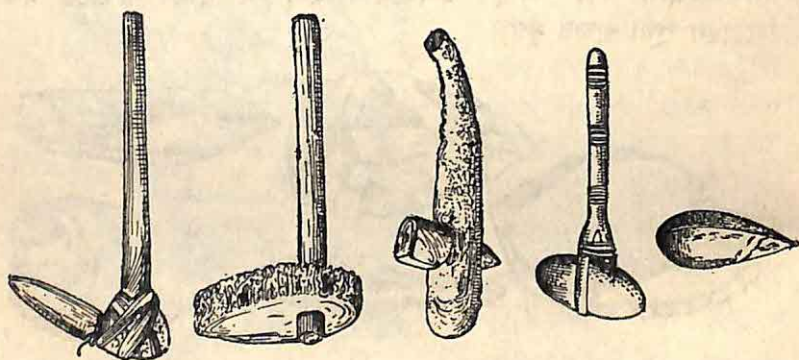
নব-প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও অস্ত্র

এবড়ো-খেবড়ো ভোঁতা খোন্তা ছিল, এখন তা মসৃণ ধারালো

কুড়াল হয়ে উঠেছিল। এই যুগে তারা চাষ-আবাদ শিখেছিল। তাই তাদের চাষের উপযোগী নানা হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়েছিল। ঐ নানা ধরনের পাথরের হাতিয়ারও তারা নির্মাণ করতে শিখেছিল।

পুরা-প্রস্তর যুগের অনুন্নত পাথরের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির সঙ্গে এই যুগের নিপুণতর হাতের তৈরি হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাই পণ্ডিতেরা এই যুগের নাম দিয়েছেন **নব-প্রস্তর যুগ**।

এখন থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে নব প্রস্তর যুগের বিকাশ ঘটেছিল।

৪. মানুষ এখন খাদ্য-উৎপাদক

পুরা-প্রস্তর যুগে মানুষ খাদ্য উৎপাদন করতো না—সংগ্রহ করতো। ফলে তার খাদ্য ছিল অনিয়মিত ও অনিশ্চিত।

কিন্তু মানুষ সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফলে গাছপালা সম্পর্কে অনেক কথাই জানল। তাই নব-প্রস্তর যুগে তারা প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্য বাসস্থানের কাছেই চাষ-আবাদ শুরু করলো। এখন আর শস্যকণা ও ফল-মূল সংগ্রহের জন্য তাকে দিনান্ত বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে হ'লো না।

এতোদিন তারা বনে বনে পশু-পাখী শিকার ক'রে বেড়াতো। শিকারে পশুপাখী পাওয়াও ছিল অনিয়মিত ও অনিশ্চিত। এখন তারা সহজে পোষ মানে এমন কিছু পশু পুষতে শুরু করলো। চাষ-আবাদ করায় তারা সহজেই ঐসব পালিত পশুর খাদ্যও যোগাতে পারলো। এখন শিকারের জন্য তাদের বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানোর প্রয়োজন রইলো না। তাদের খাদ্যের একটি প্রধান অংশ মাংস তাদের কাছে সহজলভ্য হয়ে উঠলো। তারা দেখলো, কোন কোন পশুর দুধও অতিশয় উপাদেয় ও পুষ্টিকর।

এইভাবে মানুষ হয়ে উঠলো **খাদ্য-উৎপাদক**। খাদ্যের জন্য এখন আর সে প্রকৃতির দানের উপর নির্ভরশীল রইলো না।

৫. মৃৎশিল্প ও বয়নশিল্প

মৃৎশিল্প ঃ কৃষিকার্যের উন্নতির ফলে মৃৎপাত্রের ব্যবহারও অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। গম, যব প্রভৃতি শস্য বছরে একবার ফলে। শস্য সঞ্চয়ের জন্য মৃৎপাত্রের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

মনে হতে পারে যে, মৃৎশিল্প একটা সাধারণ ব্যাপার—নরম অবস্থায় মাটিকে ইচ্ছামতো আকারে গড়ে তুলে আগুনে পোড়ালেই মৃৎপাত্র তৈরি হ'লো। কিন্তু আসলে মৃৎপাত্র তৈরি করতে গেলে কতকগুলি প্রাথমিক

রাসায়নিক জ্ঞান থাকা দরকার। ভিজে বা নরম অবস্থায় পাত্রগুলি পোড়াতে গেলে তা ফেটে যায়। ঠিকমতো পোড়ানোর জন্যও একটা বিশেষ পরিমাণ তাপের দরকার। কম তাপে পাত্রগুলি পুড়বে না, আবার বেশি তাপে পাত্রগুলি ফেটে যাবে। পোড়াবার বিশেষ পদ্ধতিতে আবার পাত্রের রং লাল বা কালো হয়।

পুরা-প্রস্তর যুগে মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখেছিল। নব-প্রস্তর যুগে মানুষ সেই আগুনের তাপকে প্রয়োজন মতো ব্যবহার ক'রে বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাবার জ্ঞানও অর্জন করেছিল।

প্রথম দিকে মানুষ মাটির পাত্র আগাগোড়া হাতেই গড়তো। কিন্তু তার জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশের ফলে সে চাকের ব্যবহার শিখলো। মৃৎশিল্পে চাকের ব্যবহার এক যুগান্তকারী ঘটনা। এখন মৃৎপাত্রের গঠন কেবল সুষম হয়ে উঠলো না, হয়ে উঠলো সহজ ও দ্রুত। নব-প্রস্তর যুগের মানুষ সুন্দর, এমন কি বর্ণ-বিচিত্র পাত্র রচনার কৌশল আয়ত্ত করেছিল।

বয়নশিল্প ঃ মানুষ পুরা-প্রস্তর যুগে গাছের বাকল, পাতা ও জানোয়ারের চামড়া পরত। ঐ চামড়া থেকে পরে তারা দড়ি বানাত ও তা বুনে কাপড়ের মতো করত। কৃষিকার্যের উন্নতির ফলে তারা নানাজাতীয় উদ্ভিদের সংস্পর্শে এল এবং তাদের আঁশ বা তন্তুকে পাক দিয়ে দড়ি ও সুতো তৈরির কৌশল আবিষ্কার করল। দীর্ঘ অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার ফলেই তারা বস্ত্রবয়নে সক্ষম হ'লো। গোড়ার দিকে সম্ভবত শণ ও পাট জাতীয় উদ্ভিদের আঁশই একাজে ব্যবহৃত হ'তো। পরে তুলো ও পশুর লোমের উপযোগিতাও মানুষ বুঝতে পারল। কৃষিকার্য ও পশুপালনের উন্নতির ফলে শণ, পাট, তুলো, পশম প্রভৃতি সহজলভ্য হয়েছিল।

নব-প্রস্তর যুগে কিভাবে সুতো তৈরি হ'তো বা কাপড় বোনা হ'তো, তা জানা যায়নি। সম্ভবত ঐ যুগে ব্যবহৃত সুতো তৈরি ও কাপড় বোনার যন্ত্রপাতি কাঠের ছিল। তাই সেগুলি কালক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যাই হোক, নবপ্রস্তর যুগে বয়নশিল্পের যে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

৬. বাস-ব্যবস্থা

পুরা-প্রস্তর যুগে মানুষ সাধারণত পাহাড়ের গুহায় বাস করতো। কিন্তু কৃষিকার্যের উন্নতির ফলে তারা কৃষির উপযোগী নূতন নূতন ভূমির সন্ধানে বেরুলো। জঙ্গল সাফ ক'রে তারা কৃষির উপযোগী ভূমি তৈরী করতে লাগলো। কৃষিক্ষেত্রের কাছে বাস করার প্রয়োজন হওয়ায় তারা

গিরিগুহা ছেড়ে বাইরে এল এবং কৃষিক্ষেত্রের কাছে বাসের উপযোগী গৃহ নির্মাণ করতে লাগলো। তারা মাটির দেওয়াল দিয়েই বাড়িগুলি তৈরি করতো। ঐ সময়ে কুড়ালের ব্যবহার সুপ্রচলিত হওয়ায়, তারা গাছ কেটে কাঠের সাহায্যেও বাড়ি তৈরী করতো। নবপ্রস্তর যুগের মানুষের বাসগৃহের বহু চিহ্ন গ্রীসে, তুরস্কে, সিরিয়ায়, ইরাকে, ইরানে ও তুর্কীস্থানে পাওয়া গেছে।

মানুষ দলবদ্ধভাবে বাস করত। তাই পাশাপাশি অনেকগুলি ক'রে বাড়ি থাকত। এইসব বাড়িকে সুরক্ষিত করার জন্য ছিল পরিখা ও কাঠের বেড়ার ব্যবস্থা। যেখানে পাথর সুলভ ছিল, সেখানে তারা পাথরের বাড়ি তৈরি করতো এবং পাথরের তৈরি রক্ষাব্যবস্থাও করত। নবপ্রস্তর যুগে হ্রদ-বাসী মানুষদের দ্বারা নির্মিত এক ধরনের বাড়ির চিহ্নও পাওয়া গেছে। তা দেখে বোঝা যায়, হ্রদবাসীরা জলের মধ্যে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি পুঁতে, তার ওপর শক্ত ও মজবুত বাড়ি তৈরি করতো।

৭. যানবাহন

দূর দূর অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য পথঘাট ও যানবাহনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কৃষিকার্যে ইতিপূর্বেই মানুষ গোরুকে লাঙল টানার কাজে নিয়োগ করেছিল। এখন তারা গোরু দিয়ে গাড়ি টানাবার ব্যবস্থা করলো। গাধা, কুকুর ও বল্গা হরিণ দিয়েও তারা গাড়ি টানাতো। গোড়ার দিকে ঐসব গাড়ির চাকা ছিল না। স্লেজ-গাড়ির মতোই বিনা চাকায় মাটির উপর দিয়ে সেগুলিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হ'তো। কিন্তু চাকা আবিষ্কারের ফলে আধুনিক যানের মতো গাড়ি আবিষ্কৃত হ'লো। যানবাহনের কাজে গাধা ব্যাপকরূপে ব্যবহৃত হ'তো। গাধা মাল ও মানুষ বইতো। তবে ঘোড়ার ব্যবহার তখনো প্রচলিত হয়নি।

নবপ্রস্তর যুগে মানুষ জলযানও ব্যবহার করতো। নলখাগড়া-জাতীয় গাছের আঁটিকে শক্ত ক'রে বেঁধে নৌকা তৈরী করা হ'তো। পরে কাঠ ও তক্তা দিয়েও নৌকা তৈরী হয়েছিল। লোকে গাছের গুঁড়ি কুঁদে ডোঙা বানাতো। নবপ্রস্তর যুগের মানুষ পালের ব্যবহার জানতো বলে মনে হয় না।

৮. নব-প্রস্তর যুগে সমাজ-সংস্কৃতি

সমাজঃ কৃষিকার্য শুরু হওয়ার ফলে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস ও সমাজ-বদ্ধতার প্রয়োজন খুবই বেড়েছিল। বনজঙ্গল সাফ ক'রে কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত

করতে, খাল-নালা কেটে জলাভূমিকে কৃষির উপযোগী করতে এবং সেচ-ব্যবস্থা গ'ড়ে তুলতে সকলের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা লাগতো। সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের ফলে প্রাপ্ত কৃষিক্ষেত্রের উপর নিজ নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সকলকেই সমাজের নিয়মকানুন মেনে চলতে হ'তো।

নবপ্রস্তর যুগের যুগান্তকারী বৈশিষ্ট্যগুলির প্রায় সব ক'টিই স্ত্রীলোকের দান। কৃষিকার্য গোড়াতে স্ত্রীলোকদের হাতেই ছিল। পুরুষরা যখন পশু-শিকার, পশুচারণ, কাষ্ঠ আহরণ প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কাজে ব্যস্ত থাকতো, তখন স্ত্রীলোকরাই খোন্তা ও নিড়ানির সাহায্যে বীজ বপন ক'রে কৃষিকার্য করতো। তারাই ফসল তুলতো, ফসল থেকে খাদ্য প্রস্তুত করতো। গোড়ার দিকে মৃৎশিল্পও তাদের হাতে ছিল। বয়নশিল্পও ছিল তাদেরই আবিষ্কার। নারীই ছিল উর্বরা শক্তি ও উৎপাদন শক্তির প্রতীক।

নবপ্রস্তর যুগের শেষ দিকে কিন্তু স্ত্রীজাতির এই প্রাধান্য হ্রাস পেয়েছিল। কৃষিতে লাঙল ব্যবহার প্রবর্তিত হওয়ায় তা অধিকতর শ্রমসাধ্য হয়ে উঠেছিল। তাই কৃষিতে ক্রমেই পুরুষের প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল। মৃৎশিল্পে চাক ব্যবহারের ফলে মৃৎশিল্পেও পুরুষের প্রাধান্য দেখা দেয়। যেসব সমাজে পশুচারণ, পশুশিকার, মৎস্যশিকার, মূল্যবান প্রস্তরাদি সংগ্রহ মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল, সেগুলিতে পুরুষেরই প্রাধান্য ছিল। গৃহ-নির্মাণ যখন নলখাগড়া, কাদা ইত্যাদি সামান্য উপকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তখন সে বিষয়ে স্ত্রীলোকরাই প্রধান অংশ নিতো। কিন্তু পরে ইঁটের ও পাথরের ব্যবহার প্রবর্তিত হওয়ায় গৃহনির্মাণ শিল্পেও পুরুষের প্রাধান্য হয়।

সমাজে অনেকগুলি পরিবার একত্র বাস করতো। যৌথভাবেই উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশ নিতো। যারাই চাষ-আবাদ করতো, তারাই অবসর সময়ে পাত্রনির্মাণ, গৃহনির্মাণ, বস্ত্রবয়ন, অস্ত্র-হাতিয়ার প্রভৃতি তৈরী করতো।

স্পেনের গিরিগাত্রে অঙ্কিত প্রস্তর যুগের ছবি

ধর্মবিশ্বাস : পুরা-প্রস্তর যুগে মানুষ গুহাগাত্রে যেসব চিত্রাঙ্কন করেছিল, সেগুলি তারা, অনেকের মতে, যাদুবিদ্যার প্রয়োগের উদ্দেশ্যেই করেছিল। তীরবিদ্ধ হরিণ বা বাইসনের চিত্র অঙ্কিত ক'রে তারা শিকারেও ঐরূপ ফললাভ করবে আশা করতো। কৃষিজীবী সমাজে যখন মানুষ অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল, তখন তারা ঐসব

বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নানারূপ মাদুলি. কবচ, কড়ি, প্রস্তর প্রভৃতির যাদুশক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। স্ত্রীজাতিকেই উৎপাদিকা-শক্তির প্রতীক কল্পনা করায় তারা উৎপাদিকা-শক্তির বিধায়িকা দেবীর কল্পনাও করেছিল। ঐ সময় নির্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যেসব নারীমূর্তি পাওয়া গেছে, সেগুলিকে অনেকে উৎপাদিকা-শক্তির দেবীর মূর্তি ব'লেই মনে করেছেন। উৎপাদন-ব্যবস্থায় পুরুষের প্রাধান্য ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তারা পুরুষ-দেবতার কল্পনাও করেছিল। তারা পরলোকে বিশ্বাসী ছিল। তাই মৃতকে কবর দেওয়ার সময় জীবিত মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য, হাতিয়ার প্রভৃতিও মৃতের সঙ্গে দিতো।

শিল্প ঃ নবপ্রস্তর যুগে মৃৎশিল্প খুবই উন্নত হয়ে উঠেছিল। মৃৎপাত্রগুলির গায়ে মৃৎশিল্পীরা নানা চিত্রাঙ্কন করতো। ঐসব চিত্র দেখে তখনকার সমাজ সম্পর্কে আমরা অনেক কথাই জানতে পেরেছি। মৃৎশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিশিল্পও উন্নত হয়েছিল। ঐ সময়ে যাদুশক্তির অধিকারী ব'লে বিশ্বাস ক'রে মানুষ নানারকম ধাতু ও পাথর ব্যবহার করতো। ফলে অলংকার শিল্প এবং পাথর কাটার শিল্প যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল।

ভাষা ঃ জনসংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঐসব মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে যৌথ জীবন যাপন করায় পরস্পরের মনের ভাব বোঝা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ফলে গড়ে উঠেছিল ভাষা। নবপ্রস্তর যুগে সমাজে জনসংখ্যা যতোই বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং সমাজের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, ততোই ভাষা পরিণতি লাভ করছিল।

অনুশীলনী

১। আদিম মানুষ বলতে কি বোঝায়? এদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কি?

২। আদিম মানুষদের খাদ্য, হাতিয়ার, বাসস্থান প্রভৃতি সম্পর্কে কি জানা গেছে? কিভাবে জানা গেছে?

৩। আদিম মানুষরা আগুনের ব্যবহার জানত, তার প্রমাণ কি?

৪। প্রস্তুর যুগ কাকে বলে? প্রস্তর যুগকে প্রধান ক' ভাগে ভাগ করা হয়েছে? কেন এভাবে ভাগ করা হয়েছে? প্রধান ভাগগুলির নাম কি?

৫। পুরা-প্রস্তর যুগের লোকের হাতিয়ার ও সেগুলির ব্যবহার সম্পর্কে যা জান লিখ।

৬। পুরা-প্রস্তর যুগে মানুষ খাদ্য-সংগ্রাহক ছিল—এ কথার অর্থ কি ?

৭। নব-প্রস্তর যুগ কাকে বলে ? এ সময় হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির কি উন্নতি হয়েছিল ?

৮। নব-প্রস্তর যুগে মানুষ ছিল খাদ্য-উৎপাদক—এ কথার অর্থ কি ?

৯। মানুষ মৃৎপাত্রের ব্যবহার কিভাবে আবিষ্কার করেছিল ?

১০। নব-প্রস্তর যুগের পরিবহণ-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল ?

১১। নব-প্রস্তর যুগে মানুষ তাদের বাসস্থানের জন্য কি ব্যবস্থা করেছিল ?

১২। নব-প্রস্তর যুগের মানুষের ধর্ম সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা কিরূপ ছিল ?

১৩। এ যুগে মানুষ যে যাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী ছিল, গিরিগুহায় আঁকা ছবিগুলি থেকে তা কেমন ক'রে জানা যায় ?

১৪। শূন্য স্থান পূরণ কর ঃ

(ক) আদিম মানুষদের কপাল ছিল —, মস্তিষ্ক ছিল —। তারা — ও — বাস করত। তারা — হাতিয়ার ব্যবহার করত। (খ) পুরা প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ছিল —, — ও —। নবপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারগুলি ছিল —, — ও —। (গ) পুরা-প্রস্তর যুগের মানুষ ছিল খাদ্য- — —। নবপ্রস্তর যুগের মানুষ ছিল খাদ্য - —।

১৫। কোন্ প্রাণী থেকে মানুষের জন্ম হ'ল ?

১৬। আদিম মানুষের জীবাশ্ম কোথায় পাওয়া গেছে ?

১৭। আদিম মানুষ কিভাবে খাদ্য সংগ্রহ করত ?

১৮। আদিম মানুষেরা কোথায় বাস করত ?

১৯। প্রস্তর যুগকে পণ্ডিতগণ কয় ভাগে ভাগ ক'রেছেন ? কি কি ?

২০। পুরা-প্রস্তর যুগের প্রধান হাতিয়ার কি ছিল ?

২১। নব-প্রস্থর যুগের মানুষেরা যানবাহন হিসাবে কি ব্যবহার করত ?

২২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক. আদিম মানুষ — জেবলে — আলোকিত করত।

খ. পুরা প্রস্তর যুগের লোকেরা — জানত না

গ. প্রায় দশ হাজার বছর আগে — যুগের বিকাশ ঘটেছিল।

২৩। সঠিক উত্তরের (√) চিহ্ন দাও ঃ

ক. আদি মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করত—ভিক্ষা ক'রে, মন্ত্রের সাহায্যে, গাছপালা থেকে ফলমূল পেড়ে।

খ. আদিম মানুষ বাস করত — পাহাড়ের চূড়ায়, গুহায়, নদীর তীরে।

গ. নব-প্রস্তর যুগের প্রধান যানবাহন ছিল — পশু, নৌকা, গাড়ী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ

১. তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সূচনা—নাগরিক সভ্যতার উদ্ভব

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ ঃ নবপ্রস্তর যুগের শেষদিকে তামার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। ক্রমেই তামার ব্যবহার বাড়তে থাকে। পাথরের হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্রগুলিকে ইচ্ছামতো আকার দেওয়া খুবই কঠিন ছিল। তামা আবিষ্কৃত হওয়ায় মানুষ দেখলো, উত্তাপে তামা গলে যায়, তারপর শীতল হ'লেই তা পাথরের মতো শক্ত ও মজবুত হয়ে ওঠে। তাই এখন মানুষ তামার তৈরি হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে লাগলো। দেখতে দেখতে তামার ব্যবহার ব্যাপক হয়ে উঠলো। এখন মানব সভ্যতা পেঁছিলো নবপ্রস্তর যুগ থেকে তাম্র যুগে।

ঐ সময়ে তামার সঙ্গে বা পৃথকভাবে আর একটি ধাতু আবিষ্কৃত হ'লো —টিন। অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ বুঝলো, তামার সঙ্গে টিন মেশালে তা আরও শক্ত ও মজবুত হয়। মানুষ তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে তাদের হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে লাগলো। তামার সঙ্গে টিন মেশালে যে মিশ্র ধাতু উৎপন্ন হয়, তাকে বলে ব্রোঞ্জ। এইভাবে তাম্র যুগের সঙ্গে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগেরও সূচনা হ'লো।

তখনো লৌহের আবিষ্কার হয়নি। তাই নবপ্রস্তর যুগের পর থেকে লৌহ যুগের সূচনা পর্যন্ত কালকে বলা হয় তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ।

নগরসমূহের উদ্ভব ঃ মানুষ বনবাদাড় পরিষ্কার ক'রে কৃষিকার্য করতো। কিন্তু একই জমি থেকে কয়েক বছর ফসল তোলার পর সে জমির উর্বরা-শক্তি নষ্ট হ'তো। তখন মানুষকে আবার নূতন ক'রে বনবাদাড় পরিষ্কার ক'রে আবাদী জমি প্রস্তুত করতে হ'তো। কৃষিজীবী মানুষের কাছে এ ছিল এক মহাসমস্যা।

কিন্তু মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে দেখলো যে, জমির উপর দিয়ে বন্যা বা জোয়ার বয়ে গেলে সে জমির উর্বরা-শক্তি নষ্ট হয় না। তাই মানুষ নদীর তীরবর্তী অঞ্চলেই বসতি গ'ড়ে তুলতে শুরু করলো। কৃষিজীবী মানুষরা এখন স্থায়িভাবে নদীর তীরে বা সকল সময়ে প্রবল জলধারা পাওয়া যায় এমন স্থানে বাস করতে লাগলো। তারা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে

খাল-নালা কেটে, বাঁধ বেঁধে, জলনিকাশ ও সেচের ব্যবস্থা ক'রে কৃষিক্ষেত্র তৈরি করলো। যতোই দিন গেল, ততোই কৃষিক্ষেত্রের আয়তন বৃদ্ধি পেলো এবং সমাজে জনসংখ্যাও বাড়লো। কৃষিক্ষেত্রগুলিতে প্রচুর ফসল হওয়ায় কৃষিজাত দ্রব্য এখন উদ্‌বৃত্ত হ'তে লাগলো।

নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে নিত্যব্যবহার্য হাতিয়ারের জন্য প্রয়োজনীয় তামা, ব্রোঞ্জ ও পাথরের অভাব ছিল। ঐসব দ্রব্য অন্যান্য অঞ্চল থেকে আনতে হ'তো। পাহাড়-অঞ্চলের লোকেরা সহজেই পাথর, আকরিক পাথর, মূল্যবান শৌখিন পাথর, ধাতু প্রভৃতি সংগ্রহ ক'রে আনতো এবং কৃষকদের উদ্‌বৃত্ত জিনিসের বিনিময়ে তা দিয়ে যেতো। বনাঞ্চল থেকে মানুষরা আনতো কাঠ। সমুদ্রোপকূলের মানুষরা আনতো মাছ, ঝিনুক, শাঁখ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ও শৌখিন জিনিস। এইভাবে গড়ে উঠলো ব্যবসা-বাণিজ্য। কৃষিকার্যে উদ্‌বৃত্ত যতোই বৃদ্ধি পেলো, ততোই ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ল, ততোই নগর ও নাগরিক সভ্যতা গ'ড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হ'লো। কৃষিক্ষেত্রগুলির কেন্দ্রস্থলে গড়ে উঠল নগর বা শহর।

২. উৎপাদন-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থায় পরিবর্তন

কৃষিজীবী সমাজে কৃষক ও কৃষক-পত্নীরাই অবসর সময়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল কিছুই নিজেরাই তৈরি ক'রে নিতো। এখন এক শ্রেণীর মানুষ যেমন কৃষিকার্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করল, তেমনি কৃষিজাত দ্রব্য সমাজে উদ্‌বৃত্ত হওয়ায়, অন্যান্য মানুষরাও অন্যান্য কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করতে পারল। এইভাবে সমাজে বিভিন্ন শিল্পী ও কারিগর শ্রেণীর উদ্ভব হ'লো। এইসব শিল্পী ও কারিগররা সর্বসময় নিয়োগ ক'রে যেসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন করতো, তা কেবল স্থানীয় সমাজেই ব্যবহৃত হ'তো না। বাইরের অন্যান্য সমাজেও ঐসব দ্রব্য রপ্তানি হ'তো। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বা বিনিময়-ব্যবস্থাও ক্রমেই উন্নততর হয়ে উঠল। একই কাজে সর্বসময় নিয়োগ করায় শিল্পী ও কারিগররা ক্রমেই সুদক্ষ হয়ে উঠল। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে উন্নতি হ'লো পরিবহণ ব্যবস্থারও।

সমাজ প্রধানতঃ কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় অনাবৃষ্টি, অতি-বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলিকে আতঙ্কের সঙ্গেই মানুষ দেখতো। মানুষ এইসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ বুঝতে না পারায় দেবদেবীর পরিকল্পনা এবং তাঁদের তোষণ ও উপাসনার ব্যবস্থা করল। নগর-গুলিতে প্রতিষ্ঠিত হ'লো দেবদেবীর মন্দির। দেবদেবীর আরাধনার কাজে নিযুক্ত হলেন পুরোহিতের দল। সমাজে সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

প্রয়োজন দেখা দিল হিসাব-নিকাশের। উদ্ভব হ'লো লিপির। উদ্ভব হ'লো লিপিকর ও শিক্ষিত শ্রেণীর। এমনিভাবে সমাজে বহু শ্রেণীর উদ্ভব ঘটলো। শ্রম ও বৃত্তিতে বিভাগ দেখা দিলো।

৩. উপজাতিসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ—রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সূচনা

বিভিন্ন উপজাতি : নবপ্রস্তর যুগে জনসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে তা আরো বৃদ্ধি পেল। ফলে যা একদা কয়েকটি মাত্র পরিবার ছিল, তা এখন এক-একটি উপজাতিতে পরিণত হয়েছিল। এক-একটি উপজাতি সংঘবদ্ধভাবে বাস করতো। সব উপজাতিই কিন্তু কৃষিজীবী ছিল না। অনেক উপজাতি ছিল পশুপালক। অনেক উপজাতি মৎস্যাদি শিকারে ব্যস্ত থাকতো। অনেক উপজাতি প্রস্তরাদি সংগ্রহ করতো। এই সব উপজাতির জীবনযাত্রার ধরন ও মান একরূপ ছিল না! বিভিন্ন উপজাতি নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য অন্যান্য উপজাতির লোকদের উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় ক'রে নিজেদের প্রয়োজন মেটাত। কিন্তু তাতে তারা সব সময় সন্তুষ্ট থাকতো না।

দুর্ধর্ষ উপজাতিগুলি অন্য উপজাতির উপর হানা দিত এবং তাদের শস্য-সম্পদ লুঠ ক'রে নিয়ে যেত। এইভাবে প্রায়ই উপজাতিতে উপজাতিতে সংঘর্ষ বাধতো। অন্য উপজাতির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সকল উপজাতিকেই ঐক্যবদ্ধ ও প্রস্তুত থাকতে হ'তো।

রাষ্ট্রের সূচনা : নগরগুলিকে কেন্দ্র ক'রে বিশাল জনপদসমূহ গ'ড়ে উঠেছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে এইসব নগর ও জনপদগুলিকে রক্ষার কাজে যারা অগ্রণী হ'তো এবং বিশেষ বুদ্ধি, সাহস ও বীরত্ব দেখাতো, তারা সমাজে বিশেষ মর্যাদার আসন পেতো। প্রত্যেক নগর ও জনপদের অধিষ্ঠাতা দেবতা থাকায় তাঁদের পুরোহিতরাও সমাজে অত্যন্ত মর্যাদা পেতেন। ঐসব পুরোহিতরা প্রায়ই জ্ঞান ও যাদুবিদ্যার অধিকারী বলে পরিচিত হতেন এবং নগর ও জনপদের সমস্ত সম্পত্তিকে মূলত দেবতার সম্পত্তি ব'লে গণ্য করায় তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে এ'রা অসীম প্রভাবের অধিকারী হয়েছিলেন। এইসব পুরোহিত শ্রেণী ও বীর ব্যক্তিরাই ক্রমে সমাজে শাসকের ভূমিকা নিতেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা, ব্যক্তিগত ধনপ্রাণ রক্ষা প্রভৃতির তাগিদে সমাজের সাধারণ মানুষ সহজেই তাঁদের শাসন মেনে নিত। সকলের স্বার্থেই সমাজে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রবর্তন ও রক্ষা অপরিহার্য হয়েছিল। ফলে সমাজে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল।

৪· নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে সভ্যতার বিকাশের কারণ

নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে ভূমির উর্বরা-শক্তি স্বাভাবিকভাবেই রক্ষিত হ'তো। প্রতি বৎসর বন্যার ফলে জমিগুলিতে পলি প'ড়ে জমি হ্ত উর্বরা-
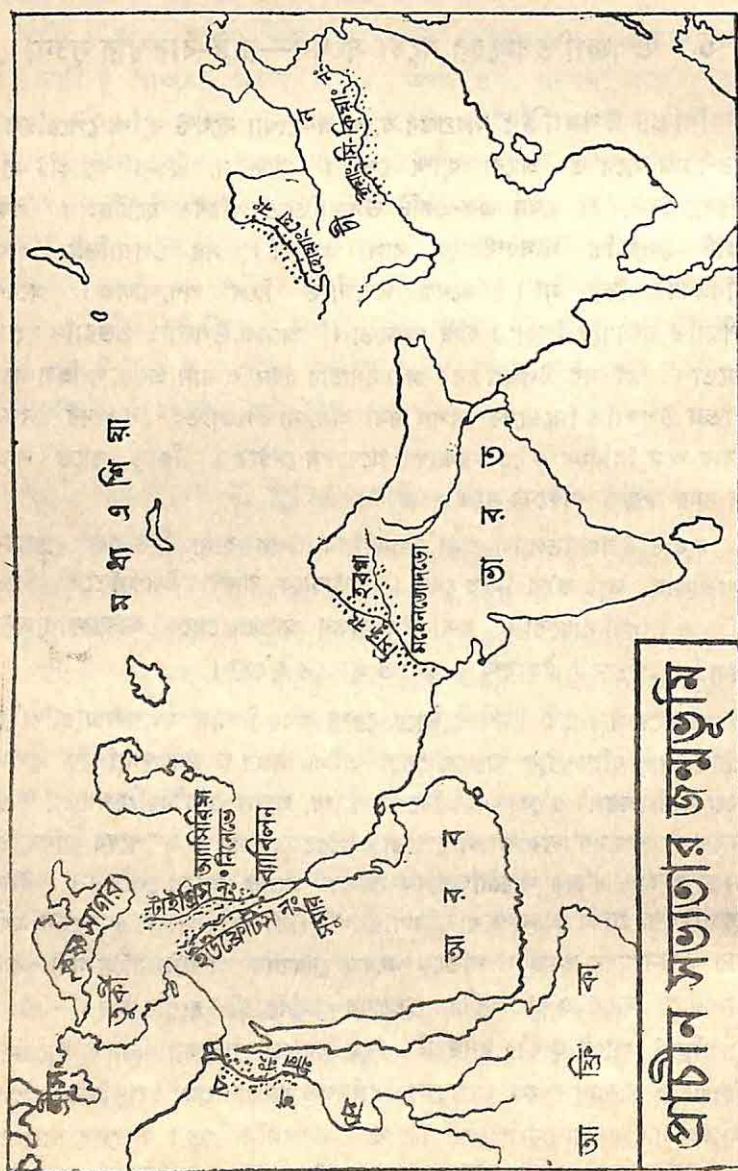
:শক্তি ফিরে পেতো। তাই এগুলি কৃষিকার্যের পক্ষে খুবই উপযোগী ছিল।

কৃষিকার্যের জন্য নূতন উর্বর ভূমির সন্ধানে মানুষকে ঘুরে বেড়াতে হ'তো না। ফলে স্থায়ী সমাজ ও নগরগুলি গ'ড়ে উঠেছিল।

নদী তীরবর্তী অঞ্চলে পশু-খাদ্যও সহজে পাওয়া যেত। তাই নদী-তীরবর্তী অঞ্চল পশুপালনেরও উপযোগী ছিল।

নদীগুলি অনাবৃষ্টির বিপদ থেকে মানুষকে সহজেই রক্ষা করতো। মানুষের জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু যে জল, তা সহজেই মিলতো।

নদীপথে আমদানি-রপ্তানি খুবই সহজ ছিল। এইসব নানা কারণেই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলিই মানব সভ্যতার শৈশবের লীলাভূমি হয়ে উঠেছিল।

এইসব কারণেই মিশরের নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চলে, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে, সিন্ধু নদ ও তার উপনদীসমূহের তীরবর্তী অঞ্চলে এবং হোয়াং হো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে মানব সভ্যতার সূচনা ও বিকাশ ঘটেছিল।

অনুশীলনী

১। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ বলতে কি বোঝ? ব্রোঞ্জ কি? এই যুগ এখন থেকে কত বছর আগে আরম্ভ হয়েছিল মনে হয়? পাথরের তুলনায় তাম্র-বোঞ্জ অধিকতর উপযোগী কেন?

২। নগর ও নাগরিক সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল কিভাবে?

৩। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে উপজাতিগুলির মধ্যে সংঘর্ষ হ'ত কেন?

৪। এ যুগে রাষ্ট্রের সূচনা হওয়ার কারণ কি?

৫। নদী-তীরবর্তী অঞ্চলেই প্রাচীন সভ্যতাগুলি গ'ড়ে ওঠার কারণ কি?

৬। ভুল অংশ কেটে দাও ঃ

(ক) তামার সঙ্গে সীসা/রুপা/টিন মিশলে ব্রোঞ্জ হয়। (খ) নবপ্রস্তর যুগে/তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে/লৌহ যুগে/নদী-তীরবর্তী অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতা-গুলি গড়ে উঠেছিল। (গ) যন্ত্রপাতির উন্নতির ফলে/কৃষির উন্নতির ফলে/শহর উদ্ভবের ফলে/মানুষ বিভিন্ন বৃত্তিতে পুরোপুরি অংশ নিয়েছিল।

৭। নব-প্রস্তর যুগের শেষদিকে কিসের ব্যবহার শুরু হয়?

৮। তাম্র যুগের মানুষেরা নতুন আবাদী জমি কিভাবে যোগাড় করল?

৯। তাম্র-যুগে সমাজ প্রধানত কিসের উপর নির্ভরশীল ছিল?

১০। দেবদেবীর আরাধনায় কারা নিযুক্ত থাকতেন?

১১। তাম্র-যুগে সমাজ শাসনের ভূমিকা কারা নিতেন?

১২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক. তাম্র যুগে মানুষ — তীরবর্তী অঞ্চলে বসতি গড়ে তুলতে শুরু করল।

খ. কৃষিকার্যে উন্নতি যতই বাড়ল, ততই — সভ্যতা গড়ে উঠল।

গ. তাম্রযুগে এক-একটি উপজাতি — বাস করত।

১৩। সঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন দাও ঃ

ক. তামার সঙ্গে আর একটি ধাতু আবিষ্কৃত হয়। তার নাম— সোনা, টিন, রৌপ্য।

খ. তাম্র-যুগের মানুষেরা আবাদী জমি সংগ্রহ করত—যুদ্ধ করে, মামলা-মকদ্দোমা করে, বন-বাদাড় পরিষ্কার করে।

গ. তাম্র-যুগে সমাজ শাসন করতেন। —সমাজপতি, পুরোহিত, সর্দার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুপ্রাচীন সভ্যতা (৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

॥ ক ॥

মেসোপটেমিয়া

১. অবস্থান ও প্রাচীনতা

সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলি নদী-তীরবর্তী অঞ্চলেই যে প্রথমে বিকাশ লাভ করেছিল, তার অন্যতম প্রমাণ মেসোপটেমিয়া। **টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস** নদী দুটি উত্তরে আর্মেনিয়ার পর্বতশ্রেণী থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণে পারস্যোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। এই নদী দুটিতে প্রায়ই বন্যা হওয়ায় এই নদী দুটির প্রবল জলধারা বয়ে এনেছে প্রচুর পলিমাটি এবং এই দুই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলকে ক'রে তুলেছে উর্বর। গ্রীকরা এই অঞ্চলের নাম দিয়েছিল মেসোপটেমিয়া বা **তুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ**।
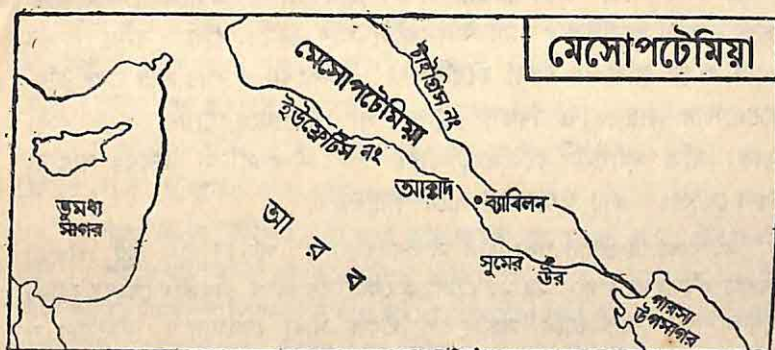
মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশেই প্রথমে মানুষ বসতি স্থাপন করেছিল। এই অঞ্চলের নাম **সুমের**। এই অঞ্চলে বহু শহর গড়ে উঠেছিল। যেমন, এরিদু, উর, ইরেক্, লাগাশ, লারসা ইত্যাদি। এইসব শহর কিন্তু একদিনে গড়ে ওঠেনি। এইসব শহরের ধ্বংসাবশেষ যেসব পাহাড়ের মতো উঁচু উঁচু টিলা খুঁড়ে বার করা হয়েছে, সেগুলিতে দেখা যায়, স্তরে স্তরে বসতির পর বসতির চিহ্ন। একবার গৃহগুলি ধ্বংস হয়ে গেলে, তার ধ্বংসস্তূপের উপর নির্মিত হয়েছে নূতন ক'রে গৃহশ্রেণী। তার ফলেই এগুলি ছোটোখাটো

পাহাড় বা টিলার আকার ধারণ করেছে। এক-একটি টিলা খুঁড়ে বিভিন্ন স্তরে পঁচিশ-ছাব্বিশটি পর্যন্ত প্রাচীন গৃহশ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করা গেছে। এইসব বিচার করে পন্ডিতরা অনুমান করেছেন যে, এখানে এখন থেকে প্রায় ছ'হাজার বছর আগে মানুষ প্রথম বসতি স্হাপন করেছিল। উপরের বসতিগুলির মানুষের ব্যবহৃত তামার হাতিয়ার ও অস্ত্র দেখে বোঝা যায়, তারা তাম্র যুগের মানুষ। সম্ভবত প্রাচীন কালে মেসোপটেমিয়াতেই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল সর্বাগ্রে।

২. বন্যানিরোধ ও ফসল

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীতে বন্যার ফলে পলি জমে এই অঞ্চলটি গ'ড়ে উঠেছিল। তাই এই অঞ্চলের উর্বরতা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ভূমি উর্বর হলেই তা কৃষিকার্যের উপযুক্ত হয় না।

উপনিবেশকারীরা বুঝেছিল, যদি খাল কেটে জলাভূমিগুলির জল নিকাশ করা যায়, যদি বাঁধ বেঁধে কৃষিক্ষেত্রগুলিকে বন্যার হাত রক্ষা করা যায়, যদি খাল-নালার সাহায্যে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করা যায়, তবেই এখানে গ'ড়ে উঠবে এক স্বর্গোদ্যান।

এ কাজ কারো একক চেষ্টায় সম্ভব ছিল না। এখানে প্রথমে যারা বসতি স্হাপন করেছিল, তারা খাল কেটে, বাঁধ বেঁধে, সেচ ও বন্যা রোধের ব্যবস্হা ক'রে কৃষিক্ষেত্র রচনা করেছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রগুলির আয়তন ও বিস্তার বৃদ্ধি পেল। প্রথমে সুমের অঞ্চলে যেসব লোক বসতি স্থাপন করেছিল, তারা সম্ভবতঃ এসেছিল উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল থেকে। এরা সুমেরীয় নামে পরিচিত।

এই অঞ্চলের প্রধান শস্য ছিল সম্ভবতঃ যব। গম বা ধান এই অঞ্চলে উৎপন্ন হ'তো বলে মনে হয় না। লোকে খেজুরের চাষও করতো। খেজুর স্হায়ী বৃক্ষ। তা স্হায়ীভাবে সহজে পুষ্টিকর খাদ্য জোগায়। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীতে ঘন ঘন বন্যা হ'তো। আর এই বন্যার ফলেই গ'ড়ে উঠেছিল মেসোপটেমিয়ার উর্বর দেশটা। তাই মেসোপটেমিয়াবাসীদের বন্যানিরোধের জন্য সুব্যবস্হা গ'ড়ে তুলতে হয়েছিল। বন্যানিরোধ কেবল কৃষিকার্যের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল না, ছিল দেশরক্ষারও অঙ্গ।

৩. অন্যান্য কাজ ও বৃত্তি

গোড়ার দিকে এখানে কৃষিজীবী গ্রামীণ সমাজই গড়ে উঠেছিল। এখানে কৃষিক্ষেত্রগুলি অত্যন্ত উর্বর হওয়ায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন

হ'তো। কিন্তু কেবল কৃষির দ্বারাই মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজন মেটে না। কৃষিজাত দ্রব্য উদ্‌বৃত্ত হওয়ায় এখানে কৃষিকার্য ছাড়াও মানুষ সহজেই অন্যান্য কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারলো। তারা মৃৎশিল্পে, ধাতুশিল্পে, প্রস্তরশিল্পে ও বয়নশিল্পে দ্রুত উন্নতি করলো। পূর্বে কাদা ও নলখাগড়া দিয়ে তারা গৃহনির্মাণ করতো। এখন তারা রোদে শুক্‌নো ইঁট দিয়ে বাড়ি তৈরি করতে লাগলো। ইঁট ও বাড়ি তৈরির কাজে এক শ্রেণীর মানুষ সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করলো।

দেশের উদ্‌বৃত্ত শস্য এবং শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ে তারা তাদের প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানী করতো। এই অঞ্চলে পাথর, আকরিক পাথর, তাম্রাদি ধাতু এবং কাঠ দুষ্প্রাপ্য ছিল। ঐগুলি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হ'তো। আমদানি ও রপ্তানির কাজে আত্মনিয়োগ করায় ব্যবসায়ী শ্রেণী গড়ে উঠলো।

বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজন ছিল যানবাহনের। তাই পরিবহণের কাজেও এক শ্রেণীর লোককে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করতে হ'লো। মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীরা চাকাযুক্ত গাড়ি, রথ এবং জলযান নির্মাণে ও চালনায় সুদক্ষ হয়ে উঠেছিল।

দেশ যতোই সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল, ততোই বাইরের শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। পার্বত্য ও মরু অঞ্চলের দুর্ধর্ষ উপজাতির লোকেরা ধনসম্পদ লুণ্ঠনের লোভে প্রায়ই আক্রমণ চালাতো। এইসব আক্রমণ থেকে দেশরক্ষার জন্য সুসজ্জিত সৈন্যদলও গড়ে উঠেছিল। ফলে এক শ্রেণীর লোক সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ করেছিল।

মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের সুবিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রগুলির কেন্দ্রে গড়ে উঠেছিল শহর। শহরে অধিষ্ঠাতা দেবতার মন্দির থাকতো। শহর ও তার পার্শ্ববর্তী কৃষিক্ষেত্র ও জনপদগুলিকে মনে করা হ'তো দেবতার দান। ফলে দেবতার প্রাপ্যরূপে বিপুল সম্পদ মন্দিরে এসে জড়ো হ'তো। দেবতার অভিলাষ বা নির্দেশ পুরোহিতদের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয় বলে মানুষের বিশ্বাস ছিল। ফলে পুরোহিত শ্রেণীর লোকের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। মন্দিরের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও কাজকর্ম পরিচালনা কেবল পুরোহিত শ্রেণীর লোকদের দ্বারাই সম্ভব ছিল না। ফলে গড়ে উঠেছিল মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র ক'রে কর্মী ও করণিকের দল।

৪. সুমেরীয়দের কৃতিত্ব

মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশকে বলা হ'তো সুমের। সুমেরীয়রা প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর অধ্যায় রচনা করেছিল। সুমেরের উত্তরে

অবস্থিত অঞ্চলকে বলা হ'তো আক্কাদ। সুমেরের কিছু পরে আক্কাদও খুব উন্নত হয়ে উঠেছিল। আক্কাদের শাসক প্রথম সারগন ২৫০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে বাহুবলে সমগ্র সুমের ও আক্কাদকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তিনি পার্শ্ববর্তী অনেক অঞ্চলও অধিকার করেন এবং দূরবর্তী স্থানেও সামরিক অভিযান পাঠান। এইভাবে একটি শক্তিশালী সুমেরীয় সাম্রাজ্য গ'ড়ে ওঠে। প্রথম সারগন সেমিটিক জাতির লোক ছিলেন। কিন্তু আক্কাদীয়রা সুমেরের উন্নততর সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিল। এইভাবে এই দুই জাতির মিলনের ফলে সুমেরীয় সভ্যতা দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল।

সুমেরীয়দের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আজও বর্তমান রয়েছে। সুমের ও আক্কাদ অঞ্চলে সুপ্রাচীন শহরসমূহের ধ্বংসস্তূপগুলিতে খননকার্য চালিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা এক বিস্ময়কর সুপ্রাচীন সভ্যতার সন্ধান পেয়েছেন।

সুপ্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় যেমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'লো পিরামিড, তেমনি সুপ্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতায় হ'লো নগরের অধিষ্ঠাতা দেবতার উদ্দেশ্যে নির্মিত সুউচ্চ মিনার ও মন্দিরগুলি। দেবতার অধিষ্ঠানের জন্য এক ধরনের সুউচ্চ মিনার নির্মিত হ'তো। সেগুলিকে বলা হয় 'জিগারট' (Ziggurat)। সুমেরীয়রা সম্ভবত পার্বত্য অঞ্চল থেকেই এসেছিল। এখানে আসার আগে তারা পর্বত-চূড়ার উপরেই দেবতার অর্চনা করতো। তাই সুমের অঞ্চলে পর্বত না থাকায় তারা সম্ভবতঃ পর্বত-প্রমাণ উঁচু মাটির মিনার তৈরি ক'রে তার উপরেই উপাস্য দেবতার বেদী নির্মাণ করতো। এইসব মিনারের তলদেশের আয়তন হ'তো প্রায় দশ হাজার বর্গফুট। ক্রমেই মন্দিরটি ধাপে ধাপে সংকীর্ণ হয়ে উপরের দিকে উঠতো। এইসব মিনারে সিঁড়ি থাকত না, থাকত চূড়ায় ওঠার জন্য তলা থেকে মন্দিরের গা বেয়ে কুণ্ডলীর আকারে পাকানো পথ। মিনারগুলি সুদীর্ঘকাল হাজার হাজার মানুষের শ্রমেই নির্মিত হয়েছিল। এগুলি সাধারণতঃ রোদে শুকানো ইঁট দিয়ে তৈরি। ইঁটের স্তরগুলির মাঝে পিচের আস্তর দেওয়া। ইঁটগুলিকে জমাট ও দৃঢ়নিবদ্ধ করার জন্য ইঁটের ফাঁকে ফাঁকে কীলকাকার পোড়ানো সব মৃৎপাত্র ঠুকে বসানো হ'তো। এগুলি নানা বর্ণের হওয়ায় মন্দিরগাত্রটি বর্ণ-বিচিত্র কারুকার্যপূর্ণ বলে মনে হ'তো। এই ধরণের মিনার ছাড়াও ছিল রোদে-পোড়া ইঁট দিয়ে তৈরি বহু মন্দির। মন্দিরগুলির ভেতরে প্রাচীরের গায়ে ছিল নানা কারুকার্য, নানা মূর্তি ও নানা বিচিত্র অলংকরণ। সুমেরীয়রা যে সেই সুপ্রাচীন কালেও স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে ও বর্ণসুষমা রচনায় কি অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছিল, তা এইসব মিনার ও মন্দির থেকে বোঝা যায়।

প্রাচীন সুমেরীয়রা ধাতুশিল্পেও খুবই উন্নত ছিল। তারা তামা ও ব্রোঞ্জের হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতো। প্রাচীন সুমেরীয়রা কেবল তামা ও ব্রোঞ্জেরই ব্যবহার জানতো না, তারা সোনা, রুপা, সীসারও ব্যবহার জানতো। সোনা ও রুপা দিয়ে তারা বহু শৌখিন জিনিস তৈরি করতো। তবে এই সময়ে লোহার ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। এইসব ধাতুশিল্পের জন্য উন্নত রাসায়নিক জ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজন ছিল। সেই সুপ্রাচীন কালেই সুমেরীয়রা তা আয়ত্ত করেছিল।

সুমেরীয়রা পাথরের কাজও খুব ভালো জানতো। তারা অত্যন্ত শৌখিন ছিল এবং যাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী ছিল। ফলে তারা অলংকার, মাদুলি, কবচ ইত্যাদি মূল্যবান্ পাথর বা রত্ন ব্যবহার করতো। এইসব মূল্যবান পাথর বা রত্ন ব্যবহারের জন্য সেগুলিতে ছিদ্র ও কারুকার্য করতে হ'তো। তাই প্রাচীন সুমেরীয়রা মণিকারের কাজেও যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিল। এইসব পাথরের আংটি বা কবচ অনেক সময় সীলমোহররূপেও ব্যবহৃত হ'তো।

মূল্যবান্ পাথর, সাধারণ পাথর, সুর্মা, সুদৃশ্য ঝিনুক, কাঠ ও অন্যান্য বহু দ্রব্য সুমেরীয়রা বিদেশ থেকে আমদানি করতো। ফলে সুমের-এ বিদেশী বণিকদের কুঠি বা আস্তানা গ'ড়ে উঠেছিল। সুমের-এ সিন্ধু অঞ্চলের যে সীলমোহর পাওয়া গেছে, তা থেকে বোঝা যায়, সুমেরের সঙ্গে সিন্ধু অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। এশিয়ার ও আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলে তৈরি অনেক জিনিস ধ্বংসস্তূপগুলিতে পাওয়া গেছে। তা থেকে বোঝা যায়, সুমের অঞ্চল বৈদেশিক বাণিজ্যে উন্নত ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে প্রয়োজন ছিল উন্নত পরিবহণ-ব্যবস্থার। পরিবহণের জন্য গোরুর গাড়ি, মালবাহী গাধা এবং দাঁড়-টানা নৌকা ও জাহাজ ব্যবহৃত হ'তো, মনে হয়।

মেসোপটেমিয়ায় প্রচলিত কীলকাকৃতি লিপি

সুমেরীয় সভ্যতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান—লিপির উদ্ভাবন। সুমেরের অধিষ্ঠাতা দেবতারা অতুল ধনসম্পদের অধিকারী ছিলেন। ঐসব ধনসম্পদের হিসাব ও বিবরণ রাখার জন্য সুমেরীয়রা লিপির উদ্ভাবন করেছিল। হয়তো গোড়ার দিকে এজন্য তারা ছবির আশ্রয় নিয়েছিল। পরে ছবিগুলি ক্রমেই সাংকেতিক রেখায় পরিণত হয় এবং কাদার ওপর কাঠি দিয়ে লেখায়
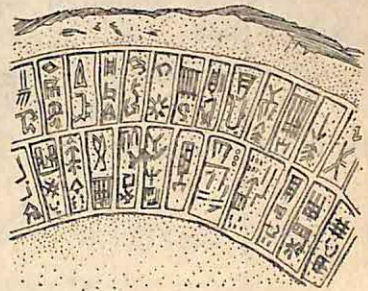
কীলকাকৃতি হয়ে ওঠে। সুমেরীয় লিপিগুলি কিউনিফর্ম বা কীলকাকৃতি লিপি নামে পরিচিত। সুমেরীয়রা এই লিপি কাঁচা মাটির টালির ওপর কাঠির আঁচড় দিয়ে লিখতো এবং টালিগুলিকে পুড়িয়ে ফেলতো। তাই এই লিপিতে লেখা বহু বিবরণ আজও অম্লান ও অটুট আছে।

॥ খ ॥

মিশর

১. মিশরের অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরে সুবিশাল সাহারা মরুভূমি অবস্থিত। এই মরুভূমির পূর্বাংশে মিশর অবস্থিত। মিশরদেশেও নীল নদের তীরে সুপ্রাচীনকালে মানব-সভ্যতার বিস্ময়কর বিকাশ ঘটেছিল। মিশর-দেশকে বলা হয় "নীল নদের দান।" একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

নীল নদের উপত্যকা
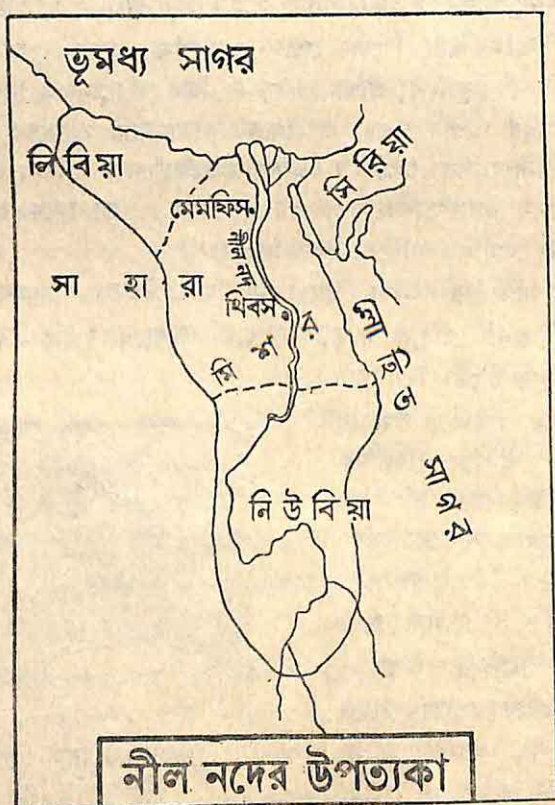
দক্ষিণে নিউবিয়ার পর্বতশ্রেণী থেকে নির্গত হয়ে নীল নদ উত্তরে

ভূমধ্যসাগরে এসে পড়েছে। যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হয়ে এই নদী সাহারার পূর্বাংশে এক সুবিস্তৃত উপত্যকার সৃষ্টি করেছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পলি মৃত্তিকা দিয়ে এই উপত্যকাকে উর্বর ক'রে তুলেছে। নীল নদ বার্ষিক প্লাবনের ফলে তীরবর্তী অঞ্চলে যে উর্বর ভূমি সৃষ্টি করেছে, তার দুদিকে আছে কঠিন পাথরের রাশি বা পাহাড়। সেগুলির পরে দুদিকেই মরুভূমি। পূর্বদিকের নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চল থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত অঞ্চলটি সংকীর্ণ এবং অনতিদীর্ঘ ; কিন্তু পশ্চিম দিকে এই মরুভূমি শত শত মাইল বিস্তৃত।

যাই হ'ক, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় ও উত্তর আফ্রিকায় ভূমি যখন ক্রমেই জলহীন ও বিশুষ্ক হয়ে উঠেছিল, তখন ঐসব অঞ্চলের মানুষের কাছে নীল নদের তীরবর্তী এই উর্বর অঞ্চল হয়ে উঠেছিল দেবতার দান। সুপ্রাচীন এই মনুষ্যগোষ্ঠী পূর্বদিক থেকে এডেনের পথেই এসেছিল মনে হয়। তা এখন থেকে সম্ভবত সাত হাজার বছর আগের কথা।

তারা লক্ষ্য করেছিল, নীল নদে বছরে একবার বন্যা হয় এবং তখন নদীর তীরবর্তী অঞ্চল প্লাবিত হয়। কিন্তু বছরের অন্যান্য সময় নদীর গভীর খাত দিয়ে জলধারা বইতে থাকে। এখানে বৃষ্টিপাতও কম। বন্যার ফলে যে পলিমাটি পড়ে, তাতে নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চল উর্বর হয়ে ওঠে সত্য, কিন্তু কৃষিকার্যের জন্য চাই সারা বছরের মতো জল ও সেচের ব্যবস্থা। মিশরীয়রা তাই বড় বড় বাঁধ বেঁধে এবং খাল কেটে নদীগর্ভ থেকে জল তুলে সুবিস্তৃত এলাকায় সেচের ব্যবস্থা ক'রে এই উর্বর ভূমিকে কৃষিকার্যের উপযুক্ত ক'রে তুললো। তারা নিচ থেকে অনেক উপরে জল-তোলার যে কৌশল বার করল তাতে বহু ফুট গভীর থেকেও জল তোলা সম্ভব হ'ল।

কিন্তু নীল নদের তীরবর্তী এই উর্বরভূমিকে কৃষিকার্যের উপযোগী ক'রে তোলা কোনো একক চেষ্টায় সম্ভব ছিল না। এজন্য সম্মিলিত শ্রম, দক্ষ পরিচালনা, উদ্ভাবনী প্রতিভা প্রভৃতির প্রয়োজন ছিল। নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চলে যারা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তারা এ সকল বিষয়ে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিল। ফলে এখানে গড়ে উঠেছিল সুপ্রাচীন কালের এক বিস্ময়কর সভ্যতা।

২. ফারাও—পুরোহিত—লিপি ও লিপিকর—কর-সংগ্রাহক —শ্রমিকবাহিনী

ফারাওঃ মিশরের রাজাদের বলা হয় ফারাও। 'ফারাও' শব্দের অর্থ যিনি বাড়িতে থাকেন। ফারাওরা যে কিরূপ মর্যাদা ও ক্ষমতার

অধিকারী ছিলেন, তা তাঁদের নির্মিত পিরামিডগুলি থেকেই কিছুটা অনুমান করা যায়।

আগেই বলা হয়েছে, নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চলের ভূমি বাৎসরিক প্লাবনের ফলে উর্বর হ'লেও দলবদ্ধ বহু মানুষের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা ও উদ্ভাবনী শক্তির ফলেই এখানে কৃষিকার্য সম্ভব হয়েছিল। কৃষিকার্যই ছিল এখানকার সমস্ত সম্পদ্, উন্নতি এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলে। বহু মানুষকে দলবদ্ধভাবে যাঁরা পরিচালিত করতেন এবং সাহস, বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী প্রতিভা দিয়ে সাহায্য করতেন, তাঁরাই কালক্রমে বিশেষ মর্যাদা, প্রভাব ও ক্ষমতার অধিকারী হ'তেন। এঁরা ছিলেন উপজাতির দলপতি। কোন উপজাতি যখন অন্যান্য উপজাতিগুলিকে জয় ক'রে সারা মিশরে অধিকার বিস্তার করত, তখনই সেই উপজাতির দলপতি হয়ে উঠতেন ফারাও।

ক্রমেই স্বতন্ত্র উপজাতিগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠছিল। এই ঐক্য একদিনে হয়নি। প্রায় হাজার বছর ধরে সংঘর্ষ ও সংগ্রাম চলার ফলে নীল নদের উপত্যকার উত্তরাংশে একটি রাজ্য এবং দক্ষিণাংশে একটি রাজ্য গ'ড়ে উঠেছিল। কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায়, এখন থেকে প্রায় ছ হাজার বছর আগে দক্ষিণাংশের রাজা মেনেস উত্তরাংশ জয় ক'রে মিশরকে ঐক্যবদ্ধ করেন।

জনৈক ফারাও-এর ছবি

মিশরের বিভিন্ন উপজাতি বিভিন্ন জীবজন্তুকে তাদের নিজ নিজ দেবতা-রূপে পূজো করতো। যে উপজাতি যখন প্রবল হয়ে উঠতো, তখন তার অধীন উপজাতিগুলি তার দেবতাকেই প্রধান দেবতা বলে স্বীকার ক'রে নিত। রাজা মেনেস যে উপজাতির দলপতি ছিলেন, সেই উপজাতির দেবতা ছিলেন হোরাস বা শ্যেনপক্ষী। তাই এখন হোরাস বা শ্যেনপক্ষী সারা মিশরের দেবতা হয়ে উঠলেন। মেনেস সর্বদা শ্যেনপক্ষীর প্রতীক ধারণ করায় তিনিও দেবতার প্রতিনিধি ও দেবতা বলে গণ্য হলেন। এইভাবে ফারাওরা দেবতা হয়ে ওঠেন। ফারাওরা যেহেতু দেবতা, তাঁর বংশও দেববংশ। সুতরাং দেববংশের মধ্যেই তাঁকে বিয়ে করতে

হ'তো। ফলে মিশরের ফারাওরা নিজের বোন, সৎবোন, পিসী, মাসী প্রভৃতিকেই বিয়ে করতে বাধ্য হতেন।

পুরোহিত শ্রেণী : মিশরীয়রা যখন নীল নদের উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেছিল, তখন তারা অনেকগুলি উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। উপজাতিগুলি বিভিন্ন জীবজন্তুকে তাদের আদিপুরুষ মনে করতো এবং তাদের দেবতাজ্ঞানে পুজা করতো। কোন উপজাতি যখন খুব পরাক্রান্ত হয়ে অন্যান্য উপজাতিগুলিকে বশ্যতা স্বীকার করাতো, তখন বিজয়ী উপজাতির দেবতাই প্রধান দেবতা হ'তেন এবং পরাজিত উপজাতিগুলির দেবতারা নিম্নতর আসন পেতেন। এইভাবেই উত্তরের রাজ্যে নাগ-দেবতা এবং দক্ষিণের রাজ্যে শ্যেন-দেবতা প্রধান দেবতারূপে পূজিত হয়েছিলেন। পরে মিশরে পরলোক ও পুনর্জীবনের দেবতা **ওসিরিস** এবং উৎপাদনের দেবী **ইসিস** প্রধান দেব-দেবীরূপে পূজিত হতে থাকেন। পরে মিশরে **আমন-রা, আটন** প্রভৃতি রূপে সূর্যদেবতাও পূজিত হন।

মিশরীয়রা এইসব দেবতার উদ্দেশে নগরে নগরে মন্দির নির্মিত করতো এবং তাঁদের পুজার জন্য থাকতো পুরোহিতের দল। পুরোহিতরা সমাজে অতিশয় মর্যাদার আসন পেতেন। তাঁদের মধ্য দিয়েই দেবতারা তাঁদের অভিলাষ ব্যক্ত করেন ব'লে জনসাধারণ বিশ্বাস করতো। পুরোহিতরাও নানাপ্রকার জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁরা যাদুবিদ্যা ও দৈবী শক্তির অধিকারী ব'লে লোকে ভাবতো। নীল নদে বৎসরে একবার বন্যা আসতো। পুরোহিতরা দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ফলে পূর্ব থেকেই ঘোষণা করতে পারতেন, ঠিক কোন্ দিনে নীল নদে বন্যা আসবে। তাঁরা এই জ্ঞান অর্জনের জন্য দিনের পর দিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত গণনা করতেন। এইরূপ গণনার ফলে তাঁরা জানতে পারেন যে, একটি বন্যা থেকে পরবর্তী বন্যার মধ্যে থাকে ৩৬৫ দিনের ব্যবধান। এইভাবে মিশরীয় পুরোহিতরাই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সৌর বৎসর গণনা করেন। তাঁরাই সৌর বৎসরকে বারো মাসে বিভক্ত করেন। মিশরে ৪২৪১ খৃীষ্টপূর্বাব্দ থেকে বর্ষ গণনা শুরু হয়।

বৎসরান্তে আবার কবে নীল নদ বন্যায় প্লাবিত হবে, তা আগে থেকেই তাঁরা সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারতেন। জনসাধারণ এইসব জ্ঞানের অধিকারী না হওয়ায় তারা অবাক হ'ত এবং মন্দিরের পুরোহিতকে বিস্ময়কর দৈবী শক্তির অধিকারী ব'লে মনে করতো।

লিপি—লিপিকর : সুমেরীয়রা যেমন এক ধরনের লিপি আবিষ্কার করেছিল, তেমনি প্রাচীন মিশরীয়রাও এক ধরনের লিপি আবিষ্কার করে-

ছিল। মন্দিরের পুরোহিতরাই ছিলেন এই লিপির আবিষ্কর্তা। গোড়ার দিকে মন্দিরের ধনসম্পত্তির হিসাব-নিকাশ রাখার কাজেই এই লিপি ব্যবহৃত হ'তো। তাই এই লিপি হায়েরোগ্লিফিক বা পবিত্র লিপি নামে
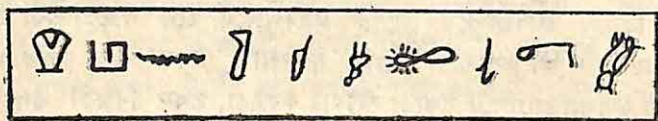
মিশরের হায়েরোগ্লিফিক লিপি

পরিচিত। সুমেরীয় লিপি যেমন এক ধরনের চিত্রলিপি থেকে উৎপন্ন হয়েছিল, মিশরীয় লিপিও তেমনি এক ধরনের চিত্রলিপি থেকেই উৎপন্ন হয়েছিল। গোড়ার দিকে ছবির সাহায্যে কিছু বোঝানো হ'তো। ছবিগুলির রূপ ক্রমেই পরিবর্তিত হ'তে থাকে, এবং সেগুলি ধ্বনির পরিবর্তেও ব্যবহৃত হয়।

সুমেরীয়রা কাদার টালির উপর কাঠির আঁচড় দিয়ে লিখতো। কিন্তু মিশরীয়রা লিখতো 'প্যাপিরাস' নামে নল-খাগড়া-জাতীয় একরকম গাছের পাতলা ডাঁটাকে জুড়ে তাতে কালি ও কলমের সাহায্যে। এই 'প্যাপিরাস' কথা থেকেই ইংরেজীতে কাগজের নাম হয়েছে পেপার।

এইসব প্যাপিরাসে লেখা অসংখ্য বিবরণ এখন মিশরের সুপ্রাচীন মন্দির ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষগুলিতে পাওয়া গেছে। এইসব অক্ষরের কথা মানুষ ভুলেই গিয়েছিল। পণ্ডিতদের দুষ্কর সাধনার ফলেই এগুলির পাঠোদ্ধার এখন সম্ভব হয়েছে। এইসব লিপির পাঠোদ্ধার হওয়ায় সুপ্রাচীন মিশর সম্পর্কে অনেক কথাই নিশ্চিতভাবে জানা গেছে।

এইসব লিপিতে মন্দিরের ও প্রাসাদের ধনভাণ্ডার ও শস্যভাণ্ডারের হিসাব-নিকাশ ও বিবরণ লেখা হ'তো। সেজন্য একটি শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। তাঁদের **লিপিকর** বা করণিক শ্রেণী বলা চলে। এই সব লিপিকর ও করণিক মন্দিরে পুরোহিত শ্রেণীর কাছেই শিক্ষা পেত। তাই মিশরীয় মন্দিরগুলি একপ্রকার বিদ্যালয়ও ছিল।

কর-সংগ্রাহক : মিশরীয়দের যেমন রাজকর দিতে হ'তো, তেমনি তারা মন্দিরেও দেবতার প্রাপ্য জমা দিত। দেশে মুদ্রা প্রচলন না থাকায় ঐ কর শস্য, পশু বা দ্রব্য-সামগ্রীতে দেওয়া হ'তো। তাই কর আদায়ের জন্য বহু কর-আদায়কারী কর্মচারী নিযুক্ত থাকতো। এই রাজকর সাধারণতঃ বাঁধ, খাল, সেচব্যবস্থা, মন্দির, পিরামিড ইত্যাদি নির্মাণে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য ব্যবহৃত হ'তো।

সৈনিক : সারা দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, মিশরের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করতে, বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রয়োজন ছিল সৈন্যবাহিনীর। সৈন্যরা তীরধনু ও ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতো।

শ্রমিক-বাহিনী : নীল নদের বন্যার উপরই কৃষি নির্ভরশীল ছিল। তাই বৎসরের একটা নির্দিষ্ট সময় কৃষকরা কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকত। বাকী সময়টা তারা দেশের পথঘাট, প্রাসাদ, মন্দির, পিরামিড প্রভৃতি নির্মাণে নিযুক্ত থাকত। তাছাড়া নির্মাণকার্যে দক্ষ শ্রমিকরাও ছিল। এই লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের ব্যয়ভার বহন করত সরকার। মিশরে স্বাধীন শ্রমিকই ছিল বেশী। তবে ক্রীতদাসরাও শ্রমিকরূপে ব্যবহৃত হ'তো। তাদের সংখ্যাও কম ছিল না।

বণিক শ্রেণী : মিশরে মেসোপটেমিয়ার মতো পাথরের অভাব ছিল না সত্য, কিন্তু সোনা, রূপা, তামা, সীসা প্রভৃতি ধাতু এবং মূল্যবান্ পাথরের যথেষ্ট অভাব ছিল। এই অঞ্চল মরুপ্রধান হওয়ায়, এখানে ব্যবহারের উপযোগী কাঠেরও অভাব ছিল। এইসব জিনিস মিশরকে প্রায়ই বাইরে থেকে আমদানি করতে হ'তো। সেজন্য মিশরে একটি ব্যবসায়ী শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। ঐ সময়ে মুদ্রার প্রচলন না থাকায়, প্রধানতঃ পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমেই ব্যবসা চলতো। অনেক সময় সোনা ও রূপা বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হ'তো। মিশরে পরিমাপের বা ওজন করার সুনির্দিষ্ট মানও প্রচলিত ছিল। জলপথেই মিশরীয়রা বেশির ভাগ বাণিজ্য করতো। এইজন্য নৌবিদ্যায় তারা পারদর্শী হয়ে উঠেছিল।

৩. পিরামিড

খুব প্রাচীনকাল থেকেই মিশরীয়রা বিশ্বাস করতো যে, মৃত্যুতেই মানুষের জীবনের শেষ হয় না। তাই মানুষের দেহ যাতে মৃত্যুর পর নষ্ট না হয়ে যায়, সেজন্য তারা চেষ্টা করতো। তারা মৃত ব্যক্তির মস্তিষ্ক, চক্ষু ও নাড়িভুঁড়ি বার ক'রে নিয়ে তারপর মৃতদেহকে সোরার জলে ডুবিয়ে রাখতো। পরে দেহের মধ্যে আলকাতারা ভরে দিয়ে হাতীর দাঁতের বা উজ্জ্বল পাথরের চোখ বসিয়ে সমস্ত শরীরকে তিন-চার ইঞ্চি চওড়া সূক্ষ্ম কাপড় জড়িয়ে ঢেকে ফেলতো। ঐ কাপড়ের উপর পিচ মাখিয়ে আবার পালিশ করা হ'তো। এইভাবে রক্ষিত মৃতদেহকে বলা হয় মমি। মৃতদেহের সঙ্গে কবরে নিত্য ব্যবহার্য সবরকম জিনিস—খাদ্য, পানীয়, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, বিলাসদ্রব্য প্রভৃতি দেওয়া হ'তো। মিশরীয়রা

মনে করতো, মৃত্যুর পরেও মানুষের জীবনে এসবের প্রয়োজন হয়। রাজা-রাজড়াদের কবরে খুবই মূল্যবান্ জিনিস দেওয়া হ'তো।

এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরীয়রা পাথরের বড় বড় বাড়ি বানাতে শুরু করে। গোড়ার দিকে ফারাওদের কবরের উপর ইঁটের সমাধি মন্দির তৈরি করাহ'তো। কিন্তু পরে তৈরি করা হ'তে লাগলো পাথরের ত্রিকোণাকার সুউচ্চ সূচ্যগ্র স্তূপ বা পিরামিড। এইসব পিরামিড আকারে ও উচ্চতায় বিভিন্নরূপ ছিল। ফারাওরা তাঁদের জীবদ্দশাতেই তাঁদের ভবিষ্যৎ সমাধিস্থলের উপর পিরামিড নির্মাণ করতেন। নীল নদের পশ্চিম দিকে গিজে নামক স্থানে ফারাও খুফ্ তাঁর ভবিষ্যৎ সমাধিস্থলের উপর যে পিরামিডটি নির্মাণ করেছিলেন সেটিই সর্বোচ্চ পিরামিড। তাই এটি মহা-পিরামিড নামে খ্যাত। এটির তলদেশের প্রতি পাশের দৈর্ঘ ৭৭৫ ফুট। উচ্চতা ৪৫০ ফুট। পণ্ডিতরা হিসাব ক'রে বলেছেন, এর ওজন ৫০ লক্ষ টন। পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে পিরামিডগুলি তৈরি। এক-একটি পাথরের ওজন বহু টন। সে-যুগে এই ভারী ভারী পাথরগুলিকে কিভাবে যে অত উঁচুতে তোলা হ'তো, তা কল্পনাও করা যায় না। যেখানে পিরামিড তৈরি হয়েছে, সেখানে কাছে-পিঠে এই ধরনের পাথর কোথাও নেই। নীল নদের অপর (পূর্ব) তীরে পাথরগুলি কেটে সংগ্রহ করতে হয়েছে। ঐতিহাসিক হেরোডটাস বলেছেন, এই পাথরগুলি কেটে সংগ্রহ করতেই এক লাখ লোককে দশ বছর কাজ করতে হয়েছে। তারপর সেগুলিকে নীল নদের স্রোতে ভেলায় ভাসিয়ে পশ্চিম তীরে এনে তুলতে হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, কত অসংখ্য মানুষ বছরের পর বছর পরিশ্রম ক'রে এক-একটি পিরামিড গড়েছে! এইসব মানুষের খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতির সমস্ত ব্যয়ই রাজকোষ থেকে জোগাতে হ'তো। ফারাওদের বিপুল খাদ্যভাণ্ডার ও ধনভাণ্ডার সম্পর্কেও এ থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়।
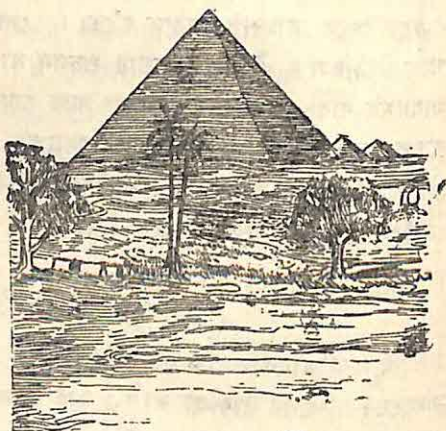
মিশরের পিরামিড

পিরামিডগুলির নির্মাণেই বিপুল অর্থ ব্যয় হ'ত না, পিরামিডের নিচে মৃত ফারাওয়ের সমাধি-কক্ষগুলিও অতুল ঐশ্বর্যে পূর্ণ থাকত। পরবর্তী-কালে চোরে ঐসব ঐশ্বর্য অপহরণ করেছে। ফারাও তুতেন্‌খামেনের পিরামিডটিই একমাত্র পিরামিড যা চোরের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। পিরামিড সম্পর্কে সকল জ্ঞাতব্য তথ্যই এই পিরামিড থেকে পাওয়া গেছে।

৪. ধর্মবিশ্বাস ও দেবদেবী

অনেকগুলি উপজাতি নিয়েই মিশরীয় জাতি গঠিত ছিল। মিশরীয় উপজাতিগুলির প্রত্যেকটিই কোন না কোন জীবজন্তুকে নিজেদের আদিপুরুষ ব'লে ভাবতো এবং সেগুলিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতো। এইভাবে সর্প-দেবতা, জলহস্তী-দেবতা, কুম্ভীর-দেবতা, শৃগাল-দেবতা, গো-দেবতা, শ্যেন-দেবতা প্রভৃতি মিশরীয় সমাজে পূজিত হতেন। একটি উপজাতি পরাক্রান্ত হয়ে যখন অন্যান্য উপজাতিকে বশ্যতা স্বীকার করাতো, তখন সেই উপজাতির দেবতা সকল উপজাতির প্রধান দেবতারূপে পূজিত হতেন। হোরাস বা শ্যেনপক্ষীর পূজক উপজাতির নেতা ফারাও মেনেস যখন সমগ্র মিশর জয়
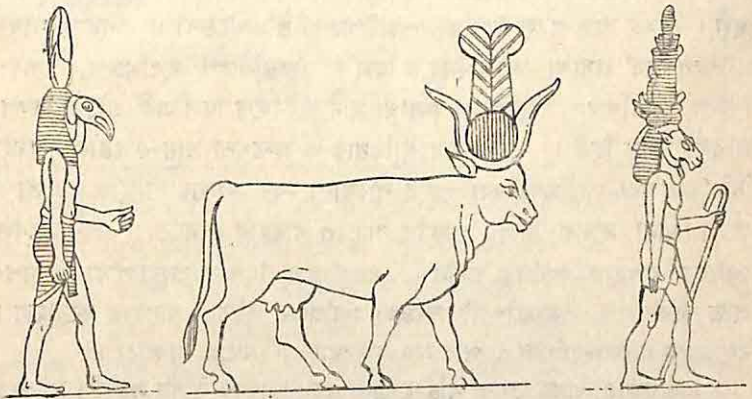
মিশরীয় দেবদেবী

ক'রে এক ঐক্যবন্ধ জাতির সৃষ্টি করলেন, তখন হোরাস বা শ্যেনপক্ষী-দেবতা মিশরের প্রধান দেবতা হলেন।

যতোই দিন যেতে লাগলো, ধর্মচিন্তাতেও পরিবর্তন এলো। সূর্য দেবতা এবং নীলনদ-ই মিশরীয়দের জীবন ও ধনসম্পদের মূলে থাকায় সূর্য-দেবতা আমন-রা-র পূজা শুরু হ'লো। আকাশচারী শ্যেনপক্ষী কিছু-দিনের মধ্যে আকাশের দেবতা সূর্যের সঙ্গে এক হয়ে গেলেন।

অন্যান্য প্রাচীন দেশের মতোই মিশরে পুরাণ-কাহিনী গ'ড়ে উঠলো। সূর্যদেবতার পৌত্র ও পৌত্রীরূপে কল্পনা করা হ'লো **ওসিরিস** ও **ইসিস** নামে দুই দেবদেবীকে। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের অধীশ্বর হলেন ওসিরিস। ইসিস হলেন জীবন ও উর্বরাশক্তির অধীশ্বরী। এঁরা ভাই-বোন হ'লেও স্বামী-স্ত্রী। পৌরাণিক কাহিনীতে আবার এঁদের পুত্র ব'লে কল্পনা করা হ'লো হোরাসকে। তাছাড়া, মিশরীয়রা আরও অনেক দেব-দেবীর কল্পনা করলো।

ফারাওকে মিশরীয়রা দেবতা বলেই মনে করতো।

মৃত্যুতেই জীবনের শেষ হয় না, এই বিশ্বাসও ছিল মিশরীয় ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ।

৫. অন্যান্য বিভিন্ন বৃত্তি

মিশরীয় সমাজ প্রধানত কৃষিজীবী ছিল। কিন্তু কেবল কৃষিজাত দ্রব্য উদ্‌বৃত্ত থাকায় এবং সেই উদ্‌বৃত্ত রাজার ও মন্দিরের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হওয়ায় তা থেকে অন্যান্য বৃত্তির বিকাশ সহজেই সম্ভব হয়েছিল।

মিশরে পুরোহিত, লিপিকর, করণিক, কর-আদায়কারী কর্মী, রাজ-কর্মচারী, মন্দিরের কর্মচারী, সৈনিক প্রভৃতির বৃত্তিতে অসংখ্য মানুষ নিযুক্ত ছিল। সেই সঙ্গে গ'ড়ে উঠেছিল—কারিগর ও শ্রমিক শ্রেণী। নির্মাণকার্যে ও শিল্পকার্যে অসংখ্য লোক নিযুক্ত ছিল। বয়নশিল্পে, মৃৎশিল্পে, প্রস্তর-শিল্পে, কাষ্ঠশিল্পে, ধাতুশিল্পে অসংখ্য মানুষ নিযুক্ত ছিল এবং এইসব শিল্প অতিশয় উন্নত ছিল। এই সময়ে হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র তাম্র ও ব্রোঞ্জ দিয়েই নির্মিত হ'তো। মিশরীয়রা প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণালংকার ব্যবহার করতো। তারা সোনা, সীসক, রুপা, প্রভৃতি ধাতুরও ব্যবহার জানতো। তবে তখনও লোহের ব্যবহার প্রচলিত হয়নি। ধাতুশিল্প মিশরে অভূতপূর্ব বিকাশ-লাভ করেছিল। মিশরীয়রাই সম্ভবত সর্বপ্রথম কাচের ব্যবহার করেছিল। বহুলোক ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবহণ ব্যবস্থাতেও নিযুক্ত থাকতো।

এক কথায়, এখন থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেও মিশর সভ্যতা যে স্তরে উন্নীত হয়েছিল, তার তুলনা নেই।

সিন্ধু উপত্যকা

॥ গ ॥

সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলের সুপ্রাচীন সভ্যতা

মেসোপটেমিয়া ও মিশরে যখন প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, তখন ভারতবর্ষের সিন্ধু নদ ও তার উপনদীগুলির তীরবর্তী অঞ্চলেও প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল।

১. সিন্ধু অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার

এখন থেকে কিছু কম ষাট বছর আগেও সকলের ধারণা ছিল, ভারতে আর্য সভ্যতাই প্রাচীনতম সভ্যতা। অর্থাৎ এখন থেকে মাত্র সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ভারতীয় সভ্যতার সূচনা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ এখনকার পাকিস্তানে সিন্ধু নদ ও তার উপনদী রাবি নদীর তীরে দুটি সুপ্রাচীন কালের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় এই ধারণা বদলে গেছে।
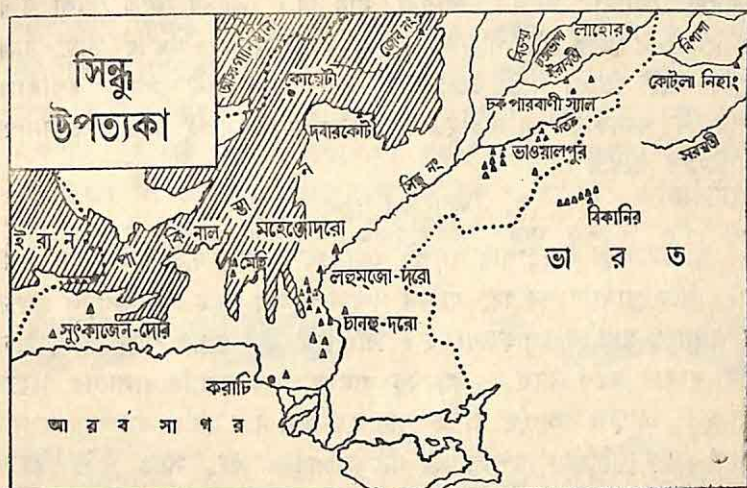
জানা গেছে, ভারতবর্ষের সিন্ধু নদ ও তার উপনদীগুলির তীরবর্তী অঞ্চলেও তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে এক সুপ্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

সিন্ধু নদের তীরে মহেঞ্জোদড়োতে এবং রাবি নদীর তীরে হরপ্পাতেই প্রথমে খননকার্য চালানো হয়। পরে পার্শ্ববর্তী বহু স্থানেই খননকার্য চালানো হয়েছে। এই খননকার্যের ফলে বিভিন্ন স্থান থেকেই একই ধরনের হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, অলংকার, মৃৎপাত্র, গৃহ, ভুক্তাবশেষ, সীলমোহর, খেলনা, মূর্তি প্রভৃতি পাওয়া গেছে। তা থেকে পণ্ডিতরা অনুমান করেছেন, এই সভ্যতা উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে আরব সাগর পর্যন্ত সুবিস্তৃত অঞ্চলে গ'ড়ে উঠেছিল।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদড়োতে খনন-কার্য শুরু করেছিলেন। এখানে প্রায় এক বর্গমাইল জায়গা খোঁড়া হয়েছে। এইভাবে খোঁড়ার ফলে সেখানে মাটির তলায় একই জায়গায় পর পর কয়েকটি স্তরে পর পর কয়েকটি শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। পণ্ডিতরা

অনুমান করেছেন যে, এখন এই অঞ্চল শুষ্ক ও বৃষ্টিহীন হ'লেও পূর্বে বৃষ্টি-প্রধান ছিল। ফলে সিন্ধু নদে প্রায়ই প্রবল বন্যা হ'তো। বন্যায় শহর ধ্বংস হ'লে অনেক দিনের জন্য তা পরিত্যক্ত থাকতো। পরে বন্যার পলিতে ঐ শহর ঢাকা পড়ে যেতো। তখন আবার গড়া হ'তো নূতন শহর। সবচেয়ে নিচের শহরটি থেকে উপরের শহরটি নির্মিত হ'তে নিশ্চয় বহু শতাব্দী লেগেছিল। এখানে সোনা, রূপা, সীসা, তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি দিয়ে তৈরি গহনা, হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। কিন্তু লোহার কোনো জিনিস পাওয়া যায় নি। এইসব থেকে বোঝা যায় এখানে এখন থেকে প্রায় পাঁচ-ছ হাজার বছর আগে—অর্থাৎ তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে—এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। হরপ্পাতেও একই সময়ে দয়ারাম সাহনি খননকার্য চালিয়েছিলেন। হরপ্পাতেও একই ধরনের জিনিসপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

২. নগরের গঠন বিন্যাস

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় ব্যাপক খননকার্য চালিয়ে দুই-কামরাওলা ছোট বাড়ি থেকে প্রাসাদোপম বহু বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে। বাড়িগুলি রোদে শুকানো ও আগুনে পোড়ানো ইঁট দিয়ে তৈরি। অনেক বাড়িতে দু-তিন তলা থাকার চিহ্নও আছে। বড় বড় থামওয়ালা কতকগুলি দালানের চিহ্নও আছে। এগুলি সভাগৃহ বা উপাসনাগৃহ ছিল মনে হয়। হরপ্পায় পাওয়া গেছে একটি সুবিশাল শস্যাগারের ধ্বংসাবশেষ। বহু সারি সারি ছোট
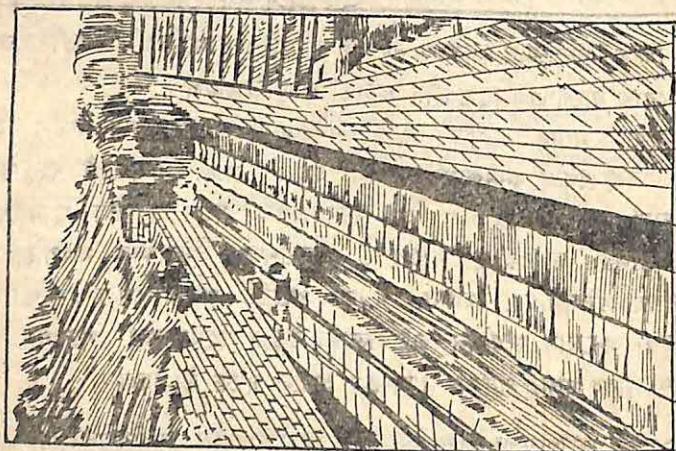
মহেঞ্জোদড়োর প্রধান রাজপথ

ছোট বাড়ির চিহ্নও আছে। এগুলি সম্ভবত শ্রমিকদের বস্তি বা বাজারের দোকানের সারি ছিল।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা শহর সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি হয়েছিল। পথগুলি সোজা, চওড়া ও সমান্তরাল। কে বা কারা যেন মেপেজুখে হিসাব-নিকাশ ক'রে ঐগুলি তৈরি করেছিল। পথের ধারে ছিল ঢাকা নর্দমা। বাড়ির ওপরতলা থেকে মলমূত্রাদি নির্গমেরও ব্যবস্থা ছিল। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা শহরগুলি যে খুবই পরিচ্ছন্ন ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

এখানকার পৌর জীবন কেবল পরিচ্ছন্ন ছিল না। স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল। এখানে একটি সুবৃহৎ স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। স্নানাগারটি লম্বায় ১৮০ ফুট, চওড়ায় ১০৮ ফুট। এর চারদিকে ৮ ফুট পুরু দেওয়াল। স্নানাগারের মাঝখানে সাঁতার কাটার উপযোগী একটি মস্ত চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চায় নামার জন্য সি'ড়ি আছে। চৌবাচ্চার চারদিকে গ্যালারি। গ্যালারিগুলির পেছনে আছে অনেক কামরা। কামরাগুলির মধ্যে কূপ। কূপ থেকে
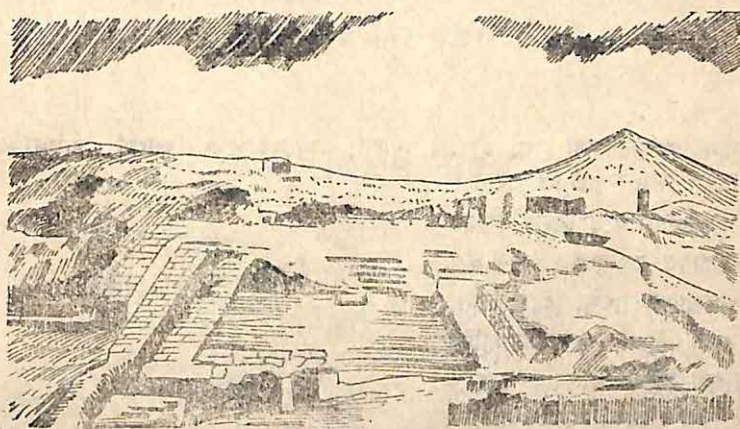
মহেঞ্জোদড়োর আবিষ্কৃত স্নানাগার

চৌবাচ্চা জলে ভরা যেত। এখানে চুল্লীর চিহ্ন দেখে বোঝা যায় যে, বাষ্পস্নানের ব্যবস্থাও ছিল।

৩. খাদ্য ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি

খননকার্যের ফলে যেসব ভুক্তাবশেষ পাওয়া গেছে, সেগুলি থেকে জানা যায়, এখানকার লোকে গম, যব, খেজুর, মাছ, মাংস ইত্যাদি খেতো। সুতী

ও পশমী কাপড়ের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এখানে সোনা, রূপা, হাতির দাঁত, ঝিনুক ও দামী পাথরের নানারকম সুন্দর সুন্দর গয়না পাওয়া গেছে।
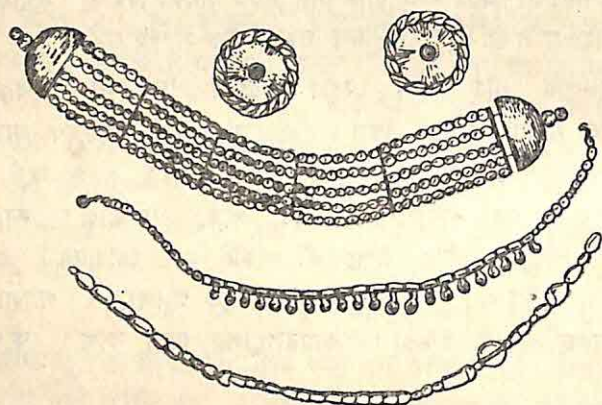
মহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত গহনা

এইসব গয়নার মধ্যে হার, হাতের বালা, কানের দুল, আংটি, নাকছাবি, পায়ের তোড়া প্রভৃতি প্রধান।

এখানে খুব উন্নত ধরনের মৃৎপাত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়াও পাওয়া গেছে তামা, ব্রোঞ্জ, রূপা ও চীনামাটির সুন্দর সুন্দর বাসন। হাড় ও হাতির দাঁতের সূচ ও চিরুণি, মাটির, চীনামাটির ও হাড়ের মাকু ও কাটিম, তামা ও ব্রোঞ্জের দা, ছুরি, কুড়াল, ক্ষুর এবং ব্রোঞ্জের আয়নাও পাওয়া গেছে। বিভিন্ন ওজনের চৌকো পাথরের টুকরোও পাওয়া গেছে। সেগুলো সম্ভবত বাটখারারূপে ব্যবহৃত হ'তো।

মহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত মৃৎপাত্র

বহু খেলনা, পুতুল ও মূর্তিও পাওয়া গেছে। খেলনার মধ্যে মাটির

তৈরি চেয়ার, গোরুর গাড়ি প্রভৃতি আছে। নাচের ভঙ্গিতে তৈরি পুতুলগুলি দেখে মনে হয়, এখানকার মেয়েরা নাচতে জানতো। চুল ঘাড়ের ওপর ফেলতো। একটি বড় পুরুষের মূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তি দেখে বোঝা যায়, এখানকার লোকে শালের মতো কারুকার্য করা চাদর গায়ে দিতো, দাড়ি রাখতো, কিন্তু ঠোঁটের উপরের চুল কামাতো।
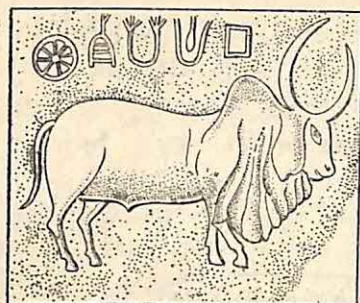
সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত একটি সীলমোহর

এখানে কয়েক শ' সীলমোহর পাওয়া গেছে। সীলমোহরগুলি সম্ভবত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হ'তো। এইগুলির ওপর নানা জীবজন্তুর মূর্তি ও দুর্বোধ্য অক্ষরে কী সব লেখা আছে।

এখানে যুদ্ধাস্ত্রও কিছু পাওয়া গেছে—যেমন, টাঙি, বল্লম, গদা, ছোরা। ছোরা পাওয়া গেছে, কিন্তু তরবারি বা তীরধনুকের মতো কিছু পাওয়া যায়নি।

৪. শিল্প ও বাণিজ্য

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা কৃষির উপরই নির্ভরশীল ছিল। কৃষিকার্যে উন্নত হওয়ায় এখানে সহজে খাদ্যদ্রব্য উদ্‌বৃত্ত হ'তো এবং ঐ উদ্‌বৃত্ত খাদ্যদ্রব্যের সাহায্যেই বহুরকম শিল্প গড়ে উঠতে পেরেছিল। এখানে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র, অলংকার প্রভৃতি থেকে সহজেই বোঝা যায়, মৃৎশিল্পে ও ধাতুশিল্পে এখানকার লোক খুবই উন্নত ছিল। সম্ভবত প্রচুর পরিমাণে এইসব শিল্পসামগ্রী উৎপন্ন হ'তো। শহরের মধ্যে সারিবদ্ধ যেসব বহু ছোট ঘরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, সেগুলি শ্রমিক ও শিল্পীদের বাসস্থান ছিল বলে মনে হয়। এখানে মেসোপটেমিয়া বা মিশরের মতো বিস্ময়কর কোনো মিনার, মন্দির বা পিরামিড আবিষ্কৃত হয় নি। তা সত্ত্বেও এখানকার লোকে যে গৃহনির্মাণশিল্পে খুবই পটু ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়।

মেসোপটেমিয়ার কিশ্ ও উর শহরে ও পারস্যের এলামে সিন্ধু অঞ্চলের সীলমোহর পাওয়া গেছে। তা থেকে বোঝা যায়, ঐসব স্থানেও সিন্ধু অঞ্চলের বণিকরা বাণিজ্য করতে যেত।

৫. দেবদেবীর উপাসনা ও ধর্মবিশ্বাস

মূর্তি ও বিভিন্ন সীলমোহর দেখে মনে হয়, এখানকার লোকে শিব ও দুর্গার মতো কোনো দেবদেবীর পূজা করতো। একটি সীলমোহর পাওয়া গেছে, তাতে জীবজন্তুর পরিবেষ্টিত একটি যোগী-মূর্তি আছে। তা দেখলে সহজেই হিন্দুদের মহাযোগী পশুপতি শিবের কথা মনে পড়ে। শিবলিঙ্গের মতো দেখতে বহু পাথরের টুকরোও পাওয়া গেছে। এখানে যেসব পুতুল ও মূর্তি পাওয়া গেছে, তার অনেকগুলিকে কেউ কেউ গৃহদেবতা ব'লে

সীলমোহরে পশুপতি যোগী-মূর্তি

মনে করেন। তবে এখানে কোনো মন্দিরের চিহ্ন বা ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি।

৬. ধ্বংসাবশেষ থেকে জ্ঞাত বিভিন্ন বৃত্তি ও শ্রেণীর পরিচয়

সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে যেসব ধ্বংসাবশেষ ও প্রাচীন সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে বোঝা যায়, এই অঞ্চলে কৃষি খুবই উন্নত ছিল এবং কৃষিজাত দ্রব্য, বিশেষতঃ খাদ্য, উদ্‌বৃত্ত হ'তো। খাদ্য উদ্‌বৃত্ত না হ'লে বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভব ছিল না; শহর গড়ে উঠা এবং নাগরিক জীবনযাত্রা সুন্দরভাবে চলাও সম্ভব হ'তো না। তাই সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে যে বহু লোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত ছিল তা সহজেই বোঝা যায়।

এখানে সুতী ও পশমী কাপড় ব্যবহারের চিহ্ন পাওয়া গেছে। যে বড় মূর্তিটি পাওয়া গেছে, তার গায়ে যে কারুকার্য-খচিত শালের

রূপ খোদাই করা আছে, তা থেকে বোঝা যায় এখাকার বয়নশিল্প বেশ উন্নত ছিল। তাঁতের মাকু, সুতো রাখার কাটিম প্রভৃতিও পাওয়া গেছে। হাড় ও হাতির দাঁতের সূচও পাওয়া গেছে। তাই সহজে বলা চলে, এখানে বয়নশিল্পে ও সূচিশিল্পে এক শ্রেণীর লোক নিযুক্ত ছিল এবং তারা নিজ নিজ শিল্পে সুদক্ষ ছিল।

এখানে যেসব মৃৎপাত্র, মাটির খেলনা ও পুতুল পাওয়া গেছে, তা থেকে বোঝা যায় এখানে একশ্রেণীর লোক মৃৎশিল্পে নিযুক্ত ছিল। তারা চীনা-মাটির পাত্রও তৈরি করতো।

এখানে সোনারূপার যে সব গয়না, তামা ও ব্রোঞ্জের যেসব হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে, তা থেকে বোঝা যায় এখানে ধাতুশিল্প খুবই উন্নত ছিল। ধাতুশিল্পে বহু লোকই নিযুক্ত ছিল।

সীলমোহর এবং বাটখারা প্রভৃতি থেকে জানা যায়, এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যে এক শ্রেণীর লোক নিযুক্ত ছিল। খেলনা গোরুর গাড়ি থেকে বোঝা যায়, এখানে গোরুর গাড়ির প্রচলন ছিল। পরিবহণের কাজেও নিশ্চয় অনেক লোক নিযুক্ত ছিল।

এখানে যুদ্ধাস্ত্র খুব বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়নি। তাই এখানে যে বড় সুগঠিত সৈন্যদল ছিল, এমন মনে হয় না। তবে নিশ্চয় দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বাইরের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য লোক যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত থাকতো। এখানকার ঘরবাড়ি ও পথঘাট নির্মাণের কাজে নিশ্চয় দক্ষ শ্রমিক ও স্থপতিরা নিযুক্ত ছিল।

এখানে মেসোপটেমিয়ার বা মিশরের মতো বড় কোন মিনার, মন্দির, পিরামিড নেই। এগুলি গড়বার জন্য খুব শক্তিধর শাসক শ্রেণীর বা পুরোহিত শ্রেণীর প্রয়োজন ছিল। এখানে মন্দির বা রাজপ্রাসাদের মতো কিছুই আবিষ্কৃত হয়নি। তাই সিন্ধু অঞ্চলের মানুষরা সভ্যতার উন্নত স্তরে পেঁছিলেও এখানে রাজা বা পুরোহিতের মতো এমন কোনো শ্রেণী গড়ে ওঠেনি, যার হাতে দেশের বিপুল সম্পদের বিরাট অংশ পুঞ্জিভূত হ'তে পারতো। তবে এখানকার সুব্যবস্থিত পৌরজীবনের চিহ্ন দেখলে বোঝা যায়, সমাজিক জীবন পরিচালনার জন্য এক শ্রেণীর দক্ষ পরিচালক ছিলেন। দেবদেবীর উপাসনা থেকেও বোঝা যায়, মানুষকে ধর্মীয় জীবনে সাহায্য করবার জন্য পুরোহিতরা হয়তো ছিলেন। এখানে লিপি বা অক্ষরের প্রচলন ছিল। সুতরাং এখানে যে একটি শিক্ষিত শ্রেণী ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এইসব লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হ'লে সিন্ধু অঞ্চলের সভ্যতা ও জন-সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যাবে।

॥ ঘ ॥

চীনদেশে সুপ্রাচীন সভ্যতার বিকাশ

যখন মেসোপটেমিয়া, মিশর ও সিন্ধু উপত্যকায় সুপ্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, তখন চীনদেশের পূর্বাংশেও ঐরূপ সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল।

চীনদেশে দুইটি সুবিশাল নদী পশ্চিমের উচ্চভূমি থেকে প্রবাহিত হয়ে পূর্বে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। এই নদী দুটির নাম হোয়াং-হো ও ইয়াং-সিকিয়াং।

হোয়াং-হো যে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত, সেই অঞ্চলের মাটি ধুয়ে আনার ফলে এই নদীর জলের রং কিছুটা হলদে। তাই হোয়াং-হো নদীর আর এক নাম পীত নদী।

এই দুই নদীর প্রবল জলস্রোত প্রচুর পলি বয়ে আনায় এই দুই নদীর তীরবর্তী অঞ্চল খুবই উর্বর। ফলে সুপ্রাচীন কালেই এখানে জনবসতি গ'ড়ে উঠেছিল। ভূমির উর্বরতার জন্য এখানে কৃষিকার্য সহজ ছিল। এখানে ধান, জোয়ার ও সোয়াবিন প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হ'তো। কৃষি উৎপাদন সুপ্রচুর হওয়ায় সহজেই উদ্‌বৃত্ত হ'তো। ফলে সভ্যতা-সংস্কৃতির দ্রুত বিকাশ ঘটেছিল।

যে জনসমাজ এখানে সেইযুগে বসতি বিস্তার করেছিল, আদিম কৃষি-সমাজের মতোই তাকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। এই দুই নদীতে প্রবল বন্যা হ'তো। বন্যার ফলে এই অঞ্চলের উর্বরতা বৃদ্ধি পেলেও বন্যা বসবাস এবং চাষ আবাদের পক্ষে ছিল ক্ষতিকর। তাই বন্যার বিরুদ্ধে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তার প্রমাণ রয়েছে এদের দেশে প্রচলিত প্রাচীন কাহিনী-কিংবদন্তীর মধ্যে।

একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে, এখন থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে একবার চীনদেশে ভয়ংকর বন্যা হয়। তাতে শত শত মাইল অঞ্চল ভেসে যায়। বহু লোক, গবাদি পশু মারা গেল, ঘর-বাড়ি ভেসে গেল, কৃষিক্ষেত্র নষ্ট হ'লো। গ্রাম, নগর, জনপদ বিপন্ন হ'লো। খাদ্য-শস্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তখন দেশের রাজা একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে বন্যা-নিরোধের ভার দিলেন। ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি উঁচু উঁচু প্রাচীর দিয়ে ও বাঁধ বেঁধে বন্যা রোধ করতে চাইলেন। কিন্তু প্রাচীর ও বাঁধে বন্যার জল বাধা পেয়ে তা আরও ফুলে ফেঁপে উঠলো এবং প্রাচীর ও বাঁধগুলি ভেঙে সমস্ত অঞ্চল ভাসিয়ে দিলো। তখন ঐ ব্যক্তির ছেলে বন্যারোধের কাজে এগিয়ে

এলেন। তিনি বন্যার জলধারাকে আটক করার চেষ্টা না ক'রে গভীর খাল নালা কেটে তাকে সুনিয়ন্ত্রিত পথে চালিত ক'রে দিলেন। নদীগুলির তলদেশ গভীর ও প্রশস্ত ক'রে দিলেন, তীরগুলিকে বাঁধিয়ে উঁচু ও মজবুত করলেন। এতে কেবল বন্যারোধই হ'লো না, নূতন নূতন উর্বর ভূমি গ'ড়ে উঠলো, সেচের সুব্যবস্থা হ'লো, গ'ড়ে উঠলো সুন্দর সুন্দর গ্রাম, নগর, জনপদ।

চীনে সুপ্রাচীনকালে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তার অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। তারা সুন্দর সুন্দর মৃৎপাত্র তৈরি করতো। শণ, তুলো ও রেশমের সুতো দিয়ে কাপড় বুনতো। মাটি ও গাছের ডাল-পালা দিয়ে ঘরবাড়ি বানাতো। পাথর বা ইঁট দিয়ে তৈরি বাড়ির কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি। তারা তামা ও ব্রোঞ্জের হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতো। ব্রোঞ্জ দিয়ে পাত্রও বানাতো।

পাশাপাশি মাটির ঘরে অনেকগুলি পরিবার পাশাপাশি বাস করতো। কৃষিক্ষেত্রগুলি পাহারা দেওয়ার জন্য এবং কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য তারা প্রায় কৃষিক্ষেত্রের পাশেই বাস করতো।

নদীর সঙ্গে সংগ্রাম করার ফলে তাদের ঐক্যবদ্ধতা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি এই সংগ্রামে যারা বুদ্ধি, কৌশল ও সাহস প্রদর্শন করতো, তারাই সমাজে আধিপত্য স্থাপন করেছিল। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিই রাজা হয়েছিল। এইভাবে সুপ্রাচীন চীনদেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাচীন কাহিনীতে চীনদেশে পাঁচজন শ্রেষ্ঠ সম্রাটের কাহিনী আছে। তাঁরা কোন না কোন বিশেষ কৃতিত্বের জন্য স্মরণীয় হয়েছেন। আদিম চীনারা নানা দেবদেবী ও অপদেবতায় বিশ্বাস করতো। তারা পূর্ব-পুরুষদের পূজা করত। তাদের সন্তুষ্ট করার ভার ছিল রাজার উপর। তাই রাজা কেবল শাসকই ছিলেন না, ছিলেন পুরোহিত-ও। তিনিই সুবৃষ্টির জন্য আকাশের কাছে প্রার্থনা জানাতেন। পরবর্তীকালে এই-ভাবেই রাজা "আকাশ-দেবতার পুত্র" আখ্যা পেয়েছিলেন।

চীনারা প্রাচীনকালেই লিপির আবিষ্কার করেছিল। এই লিপি ছিল চিত্রাক্ষর। এক-একটি শব্দের জন্য এক-একটি চিত্র ব্যবহৃত হ'ত। চীনারা সাধারণত বাঁশের ছিলায় ও হাড়ের ওপর কালি দিয়ে লিখত। এখনকার চীনা অক্ষরের সঙ্গে এই লিপির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তাই এগুলির পাঠোদ্ধার কঠিন হয়নি।

॥ ৬ ॥

নদীতীরবর্তী অঞ্চলের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

১. নদীতীরবর্তী অঞ্চলের সুযোগ-সুবিধা

সুপ্রাচীনকালে নদীতীরবর্তী কয়েকটি অঞ্চলেই মানব-সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। মানুষ যখন কৃষিকার্য শিখেছিল, তখন সে খাদ্য সম্পর্কে আত্ম-নির্ভরশীল হয়েছিল। তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ফলে কৃষির উপযোগী নূতন নূতন জমির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। বন কেটে তারা নূতন নূতন আবাদী জমি তৈরি করছিল। তাতেও জমির সমস্যা যায় নি। কারণ, কয়েক বছর আবাদ করার পর জমির উর্বরতা কমে যেতো এবং তা চাষের অনুপযুক্ত হয়ে পড়তো। তখন আবার তাদের নূতন জমির সন্ধান করতে হ'তো। এইভাবে কিছুদিন বাদে নূতন নূতন জমির সন্ধানে তাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হ'ত। তাই তারা কোথাও সুদীর্ঘকাল স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে পারতো না।

তার ওপর ছিল প্রকৃতির খেয়াল-খুশি। কখনো পরিমাণমতো বৃষ্টি হ'তো, কখনো একেবারেই হ'তো না, কখনো বা হ'তো অতিবৃষ্টি। কৃষিকার্যের পক্ষে সেটা ছিল গুরুতর সমস্যা। কোনো বৎসর অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হ'লে মানুষ খাদ্যাভাবে পড়তো, মানুষ মরতো।

কিন্তু নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে বার বার বন্যার ফলে ভূমি সর্বদা উর্বর থাকতো। সেচ ও খাল-নালার ব্যবস্থা করলে অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির সমস্যা থাকতো না।

তাই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে কৃষিজীবী মানুষ নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে এসে বসবাস করছিল। এক অঞ্চলে স্থায়িভাবে বাস করায় তারা নগর-জনপদ গ'ড়ে তুলেছিল, গ'ড়ে তুলেছিল উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

২. নদীতীরবর্তী অঞ্চলের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

নদী-তীরবর্তী অঞ্চলের ভূমি উর্বর হ'লেও তাকে কৃষিক্ষেত্রের উপযুক্ত করার জন্য প্রয়োজন ছিল বন্যানিরোধের ব্যবস্থা, জলনিকাশের ব্যবস্থা, সেচের ব্যবস্থা প্রভৃতি। তা অল্প কয়েকজন লোক বা অল্প কয়েকটি পরিবারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ জন্য প্রয়োজন ছিল বহু মানুষের ঐক্যবদ্ধ শ্রম। এইভাবে ক্রমে পরিবার ও গোষ্ঠী থেকে উপজাতি এবং পরে জাতির সৃষ্টি হয়েছিল।

বহু লোক একসঙ্গে থাকায় এবং ঐক্যবদ্ধ শ্রম করায়, তাদের সকলের

নিজ নিজ অধিকার রক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজন ঘটেছিল। এজন্য একটি শাসক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। এই শাসক শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিমান ব্যক্তিরাই হতেন প্রধান শাসক বা রাজা। এঁরা বাইরের আক্রমণ থেকেও মানুষ ও তাদের ধনসম্পদ্‌কে রক্ষা করতেন।

নদী-তীরবর্তী অঞ্চলের কৃষিজীবী এইসব মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় নানা দেবদেবী ও অপদেবতায় বিশ্বাস করতো। ঐসব দেবদেবী ও অপদেবতার সন্তোষ সাধনের ভার থাকতো এক শ্রেণীর জ্ঞানী মানুষের ওপর। এইসব মানুষ হতেন মন্দিরের পুরোহিত। মন্দিরের পুরোহিতদের মধ্যে দিয়েই দেবদেবীরা তাঁদের অভিপ্রায় প্রকাশ করতেন ব'লে লোকে মনে করতো। তাই সমাজে পুরোহিতরা খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা পেতেন এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করতেন। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে এঁরা বিস্ময়কর জ্ঞানেরও অধিকারী হতেন। তাঁরা দৈবশক্তি ও যাদুশক্তির অধিকারী ব'লেও লোকে বিশ্বাস করতো। এইসব পুরোহিতের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক সময় এতোই বৃদ্ধি পেতো যে, এঁরাই রাজা হতেন। রাজা অনেক সময় দেবতার মর্যাদাও লাভ করতেন।

নদী-তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষরা মন্দিরে বা রাজভাণ্ডারে দেবদেবীর ও রাজার প্রাপ্য হিসাবে তাদের উৎপাদিত শস্যের একাংশ কর রূপে দিতো। ফলে রাজারা ও মন্দিরগুলি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হ'তো। শস্যাগারগুলি ভরে উঠতো। ঐ শস্য দিয়ে রাজা, শাসক শ্রেণী ও পুরোহিতরা নানাপ্রকার বৃত্তির লোকেদের দিয়ে কাজ করাতেন। জীবিকার সুব্যবস্থা থাকায় বিভিন্ন শিল্পে মানুষ সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করতে পারতো। ফলে, দেশে বয়নশিল্প, মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প প্রভৃতির মতো শিল্পগুলির অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটতো। রাজা ও পুরোহিতদের হাতে বিপুল শস্য ও ধনসম্পদ্‌ থাকায় তাঁদের নির্দেশ মতো সুরম্য প্রাসাদ, মন্দির, সমাধিমন্দির প্রভৃতি নির্মিত হ'ত। গ'ড়ে উঠত বিস্ময়কর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প।

নদী-তীরবর্তী অঞ্চলগুলি কৃষির উপযোগী হ'লেও সেখানে শিল্পের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রায়ই পাওয়া যেতো না। অনেক অঞ্চলেই পাথরের অভাব ছিল; অনেক অঞ্চলে পাথর ছিল, কিন্তু কাঠ ও খনিজ দ্রব্যের অভাব ছিল। এইসব জিনিস প্রায়ই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হ'তো। দেশে যে উন্নত ধরনের শিল্পসামগ্রী উৎপন্ন হ'তো, তাও বাইরে রপ্তানি করার প্রয়োজন ছিল। ফলে গ'ড়ে উঠেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। ব্যবসা-বণিজ্যের সঙ্গে গ'ড়ে উঠেছিল পরিবহণ-ব্যবস্থা। মালবাহী পশু, গোযান, নৌকা ও জাহাজ প্রভৃতির ব্যাপক প্রয়োজন ও উদ্ভাবন ঘটেছিল।

রাজভাণ্ডারে এবং দেবভাণ্ডারে যে বিপুল পরিমাণ শস্য ও ধন-সম্পত্তি সঞ্চিত হ'তো, বা ব্যয় হ'তো সেগুলির হিসাব রাখার প্রয়োজন ছিল। এই হিসাব রাখার সূত্রেই লিপির উদ্ভাবন ঘটেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যেও প্রয়োজন ছিল লেখাজোখার। ফলে নদী-তীরবর্তী অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতাগুলিতেই বিভিন্ন ধরনের লিপির উদ্ভাবন ঘটেছিল।

নদী-তীরবর্তী অঞ্চলের এইসব সুপ্রাচীন সভ্যতা তাম্র বা তাম্রব্রোঞ্জ যুগেই বিকাশ পেয়েছিল।

অনুশীলনী

১

১। 'মেসোপটেমিয়া' শব্দের অর্থ কি? কোন্ অঞ্চলে মেসোপটেমিয়া অবস্থিত? মেসোপটেমিয়ার প্রধান নদী দুটির নাম কি?

২। মেসোপটেমিয়ায় কৃষিজীবী মানুষ কেন উপনিবেশ স্থাপন করেছিল? তারা কিভাবে কৃষিক্ষেত্রগুলি প্রস্তুত করেছিল? সেখানে কি শস্য ও ফল প্রধানত উৎপন্ন হ'ত?

৩। সুমের কোথায় অবস্থিত ছিল? সেখানে দেবার্চনার জন্য সুউচ্চ মিনার কেন ব্যবহৃত হ'ত? ঐসব মিনারকে কি বলা হ'ত? ঐসব মিনারের গড়ন কেমন ছিল?

৪। সুমেরের সুপ্রাচীন মিনার ও মন্দিরগুলির গঠন সম্পর্কে যা জান লিখ।

৫। সুমেরীয় লিপির নাম কি? কেন ঐরূপ নাম হয়েছে? ঐ লিপি কি ভাবে লেখা হ'ত? ঐ লিপিগুলি আজও অক্ষত অবস্থায় পাওয়ার কারণ কি? ঐ লিপিগুলি কেন উদ্ভাবিত হয়েছিল মনে হয়?

৬। ঠিক উক্তির নিচে দাগ দাও:

(ক) সুমেরীয় সভ্যতা নবপ্রস্তর/তাম্র-ব্রোঞ্জ/লৌহ যুগে গ'ড়ে উঠেছিল। (খ) মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ অংশের নাম আক্কাদ/বেবিলন/সুমের। (গ) সুমেরীয় মিনারগুলিকে বলা হ'ত পিরামিড/জিগ্‌গারট/মসজিদ।

৭। ঠিক উত্তরের জন্য 'হ্যাঁ' বা 'না-র' নিচে দাগ দাও:

(ক) সুমেরীয় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অনেক লোহার হাতিয়ার পাওয়া গেছে।—হ্যাঁ, না।

(খ) টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী অঞ্চলকে মেসোপটেমিয়া বলে। —হ্যাঁ, না।

(গ) সুমেরীয় মন্দিরগুলি পাথর দিয়ে তৈরি হ'ত। —হ্যাঁ, না।

২

১। মিশরকে 'নীল নদের দান' বলা হয় কেন ?

২। কিভাবে নীল নদের উপত্যকাকে কৃষির উপযোগী ক'রে তোলা হয়েছিল ?

৩। মিশর কোথায় অবস্থিত ? এখানকার ভূপ্রকৃতি কিরূপ

৪। 'ফারাও' শব্দের অর্থ কি ? ফারাওদের সম্বন্ধে যা জান লিখ।

৫। মিশরের পুরোহিত শ্রেণী সম্পর্কে কি জান ? মিশরীয় সভ্যতায় তাঁদের দান কি ?

৬। হায়েরোগ্লিফিক ও প্যাপিরাস কি ?

৭। মিশরীয় লিপিকর সম্পর্কে যা জান লিখ।

৮। পিরামিড কি ? সর্বোচ্চ পিরামিড কোন্‌টি ? কে ঐ পিরামিড নির্মাণ করেছিলেন ? সেটি কোথায় অবস্থিত ? এই পিরামিডকে পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য বলা হয় কেন ?

৯। প্রাচীন মিশরীয়দের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে কি জান ? তাদের কয়েকটি দেবদেবীর নাম কর।

১০। মিশরের মমি কি ?

১১। শূন্য স্থান পূরণ কর ঃ

(ক) ৩৬৫ দিনে যে এক বছর হয় তা আবিষ্কার করেছিলেন মিশরীয় —। (খ) মিশরের রাজাকে বলা হয় —। মিশরীয় লিপিকে বলে —। (গ) মিশরীয়রা যে নলখাগড়া-জাতীয় গাছের ডাঁটায় লিখত, তাকে বলে —। (ঘ) তা থেকেই ইংরেজী— শব্দের উৎপত্তি।

১২। ঠিক উক্তির নিচে দাগ দাও ঃ

(ক) মিশর দেশটা ইউফ্রেটিস নদীর/টাইগ্রিস নদীর/নীল নদের তীরে অবস্থিত।

(খ) মিশরীয় সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে/লৌহ যুগে/নবপ্রস্তর যুগে।

(গ) মিশরের মহা পিরামিড নির্মাণ করেছিলেন রামেসিস/তৃতীয় থুতমসিস/খুফু।

৩

১। সিন্ধু সভ্যতা বলতে কি বোঝ ? ঐ সভ্যতা এখন থেকে কত হাজার বছর আগে গ'ড়ে উঠেছিল মনে হয় ?

২। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা কোথায় অবস্থিত ? ঐ দুই শহরের ধ্বংসাবশেষ কে কে আবিষ্কার করেছিলেন ?

৩। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার নগর পরিকল্পনা সম্পর্কে কি জান ?

৪। মহেঞ্জোদড়োয় আবিষ্কৃত স্নানাগারটি সম্পর্কে যা জান লিখ।

৫। মহেঞ্জোদড়োয় নিত্য-ব্যবহার্য কি কি জিনিস পাওয়া গেছে ? সেগুলি থেকে সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে কি জানা যায় ?

৬। সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত সীলমোহরগুলি থেকে কি জানা যায় ?

৭। সিন্ধু উপত্যকার ধাতুশিল্প সম্পর্কে কি জান ? এখানকার লোকে লৌহের ব্যবহার জানত কি ?

৮। এখানকার বয়নশিল্প সম্পর্কে কি জান ?

৯। সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন সভ্য মানুষদের ধর্ম সম্পকে যা জান লিখ।

১০। ঠিক উত্তরের নিচে দাগ দাও ঃ

(ক) সিন্ধু উপত্যকার লোকে লোহা ও ঘোড়ার ব্যবহার জানত/জানত না।

(খ) এখানে লোহার কোন হাতিয়ার বা অস্ত্র পাওয়া যায় নি/পাওয়া গেছে।

(গ) সিন্ধু উপত্যকায় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে/যায় নি।

(ঘ) সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন মানুষরা প্রধানত কৃষিজীবী ছিলেন/পশু-পালক ছিলেন।

৪

১। চীনদেশে কোথায় সুপ্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ?

২। হোয়াং-হো নদীকে পীত নদী বলে কেন ?

৩। সুপ্রাচীনকালে চীনদেশে কিভাবে বন্যানিরোধ করা হয়েছিল ? এ সম্পর্কে কি গল্প প্রচলিত আছে ?

৪। প্রাচীন চীনাদের ধর্ম কিরূপ ছিল ? দেশের প্রধান পুরোহিতের কাজ কে করত ?

৫। প্রাচীনকালে চীনদেশে লিপির উদ্ভব হয়েছিল কি ? যদি হয়ে থাকে, তবে ঐ লিপি কিরূপ ছিল ? তাতে কিভাবে লেখা হ'ত ?

৬। সুপ্রাচীন চীনাসমাজে, কৃষি, শিল্প ও সমাজ ব্যবস্থা কেমন ছিল ?

৫

১। নদীতীরবর্তী অঞ্চলেই প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ কেন হয়েছিল ?

২। নদীতীরবর্তী অঞ্চলের সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি কি ?

৩। নদীতীরবর্তী অঞ্চলেই রাষ্ট্রের সূচনা হয়েছিল কেন ?

৪। নদীতীরবর্তী অঞ্চলেই প্রথম লিপির উদ্ভব হয়েছিল কেন ?

অতিরিক্ত প্রশ্ন

১। কোন্ দুটি নদী আর্মেনিয়ার পর্বত শ্রেণী থেকে উৎপন্ন হয়ে পারস্য উপসাগরে পড়েছে ?

২। কোন্ অঞ্চলের নাম সুমের অঞ্চল ?

৩। সুমের অঞ্চলের প্রধান শস্যের নাম কি ?

৪। জিগারট কাহাকে বলে ?

৫। সুমের সভ্যতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান কি ?

৬। সুমেরীয় লিপিগুলি কি নামে পরিচিত ?

৭। হোরাস কে ছিলেন ?

৮। মহেঞ্জোদড়োতে খননকার্য কে কত খ্রীস্টাব্দে শুরু করেন ?

৯। হরপ্পার খননকার্য কে আরম্ভ করেন ?

১০। সিন্ধু-সভ্যতার যুগের মানুষদের প্রধান খাদ্য কি ছিল ?

১১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) — শব্দের অর্থ যিনি বড় বাড়ীতে থাকেন।

খ) সুমের অঞ্চলের প্রধান শস্য ছিল — ।

গ) সুমেরের উত্তরে অবস্থিত অঞ্চলকে বলা হত — ।

১২। সঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন দাও ঃ

ক) পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সৌরবৎসর গণনা করেন — ফারাও, রাজা, মিশরীয় পণ্ডিত।

খ. নীলনদের দান বলা হয় — চীন দেশকে, মিশরকে, সিন্ধু অঞ্চলকে।

গ. মিশরদেশে মৃতদেহকে বলে—মমি, পিরামিড, হোরাস।

লৌহযুগের মানব-সমাজ

১. লৌহ যুগের সূচনা ও লৌহ যুগ

আধুনিক কালকে লৌহ যুগ বলা হয়। এই যুগের সূত্রপাত হয়েছিল সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে। কারণ, ঐ সময়েই লৌহের ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় এবং লৌহ তাম্র ও ব্রোঞ্জের স্থান অধিকার করে।

তবে লৌহের আবিষ্কার ও তার কিছু কিছু ব্যবহার তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগেই হয়েছিল। কারণ, ঐ যুগের কোনো কোনো ধ্বংসাবশেষের মধ্যে লোহার দানা, লোহার হাতিয়ার ও দু-একটি অস্ত্র পাওয়া গেছে। কিন্তু ঐ সময়ে নানা কারণেই লোহার ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত হয় নি। কারণ, তামা ও টিনকে যতো সহজে গলানো যায়, লোহাকে ততো সহজে গালানো যায় না। তাই লোহাকে পিটিয়ে তা থেকে হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে অনেক মেহনত লাগতো—আর ঐভাবে ইচ্ছামতো হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি তৈরি করাও সহজ ছিল না। কিন্তু পরে লোহা গালিয়ে তা থেকে সহজে হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি তৈরির কৌশল আবিষ্কৃত হ'লে লোহার ব্যবহার ব্যাপক হয়ে ওঠে। কারণ, ভূপৃষ্ঠে বা ভূগর্ভে যতো রকম ধাতু পাওয়া যায়, তার মধ্যে লোহার পরিমাণই সবচেয়ে বেশি। লোহা কেবল সহজলভ্যই নয়, লোহার দামও কম। লোহা তামা বা ব্রোঞ্জের চেয়ে অনেক কঠিন ও মজবুত। তাই লোহার ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পায় ও ও মানব সমাজে যুগান্তর আনে।

নদী-তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছিল। এইসব অঞ্চলের বাইরে পার্বত্য ও বনাঞ্চলে বহু উপজাতি বাস করত। শিকার ও পশুপালন ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতো। ফলে পার্বত্য অঞ্চলে তারা নানাপ্রকার ধাতুর ও আকরিক-প্রস্তরের সাক্ষাৎ পেতো। এরাই সর্বপ্রথম লৌহার ব্যবহার আয়ত্ত করেছিল মনে হয়। আর্মেনিয়া ও উত্তর তুরস্কের পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতি-গুলিই সর্বপ্রথম লৌহের ব্যবহার আবিষ্কার করেছিল ব'লে অনেকের ধারণা। এরা পরে মেসোপটেমিয়ার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে রাজ্য গ'ড়ে তুলেছিল। এরা লৌহাস্ত্র ব্যবহার করায় খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

এরা কেবল লৌহাস্ত্রই ব্যবহার করে নি, এরাই প্রথমে অশ্বের ব্যবহার প্রচলিত করেছিল। দ্রুতগামী অশ্ব এবং লৌহনির্মিত অস্ত্র ব্যবহার করায়

এরা দুর্ধর্ষ ছিল। এইসব লৌহাস্ত্র ও অশ্বের অধিকারী উপজাতিসমূহ নদী-তীরবর্তী তাম্র-ব্রোঞ্জ-যুগীয় সভ্য-অঞ্চলসমূহে হানা দিয়ে তাদের উপর নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। অনেক ক্ষেত্রে এদের কাছ থেকে লৌহাস্ত্র ও অশ্বের ব্যবহার শিখে নদী তীরবর্তী অঞ্চলের সভ্যজাতিগুলিও পরে পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল।

২. সামাজিক জীবনে লৌহ ব্যবহারের প্রভাব

তাম্র ও ব্রোঞ্জ-নির্মিত হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রের দাম বেশী ছিল। তাই সেগুলি সকলের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু লোহার দাম ছিল অল্প। ফলে এখন সাধারণ মানুষও সহজে লোহার হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ পেলো। ফলে কৃষিকার্যে ও শ্রমশিল্পে সাধারণ মানুষ অনেকখানি স্বাধীনতা পেলো। এখন আর তাদের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির জন্য রাজা, রাজপরিবার, সম্ভ্রান্ত পরিবার, মন্দির ও পুরোহিত শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল থাকতে হ'লো না। যুদ্ধে ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্রই ব্যবহৃত হ'তো। ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্রের দাম খুব বেশি হওয়ায় সাধারণ মানুষ যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করতে পারতো না। সেই তুলনায় লোহার অস্ত্রের দাম অনেক সস্তা হওয়ায় সাধারণ মানুষও এখন নিজে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ক'রে যুদ্ধে অংশ নিতে পারলো। লোহা আবিষ্কৃত হওয়ায় পরিবহণ ব্যবস্থারও অনেক উন্নতি হ'লো। তা ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে খুবই সহায়ক হয়ে উঠলো।

লৌহ প্রচলিত হওয়ায় শাসক শ্রেণীও পূর্বাপেক্ষা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠলো। পূর্বে যুদ্ধাস্ত্রগুলি ব্রোঞ্জনির্মিত হওয়ায়, বিরাট সৈন্যবাহিনী গ'ড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহ করা কঠিন ছিল। ব্রোঞ্জের অস্ত্র আঘাতের ফলে সহজে নষ্ট হ'তো। অন্য পক্ষে, লৌহাস্ত্র কঠিন, সুতীক্ষ্ণ ও সুলভ ছিল। লোহার অস্ত্র ব্যবহৃত হ'তে থাকায় রাজারা সহজেই বড় বড় সৈন্যবাহিনী গ'ড়ে তুলতে পারলেন। এইভাবে বহু সামরিক শক্তিতে বলীয়ান দিগ্‌বিজয়ী রাজার অভ্যুদয় হ'লো। সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হওয়ায় রাজা দেশে সর্বাধিক শক্তিধর ব্যক্তিতে পরিণত হলেন। সামরিক শক্তির দ্বারা তাঁরা কেবল স্বদেশে নয়, বিদেশেও নিজ নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করলেন।

অনুশীলনী

১। লৌহ যুগ বলতে কি বোঝ? ঐ যুগ এখন থেকে কত বছর আগে শুরু হয়েছিল মনে হয়?

২। লোহার ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় কি সুবিধা হয়েছিল?

৩। লোহার ব্যবহার প্রবর্তন করেছিল কারা? গোড়ার দিকে লোহার ব্যাপক প্রচলনের অসুবিধা কি ছিল? কিভাবে সে অসুবিধা দূর হ'ল?

৪। ঠিক উক্তির নিচে দাগ দাও ঃ

ক) লৌহ যুগ শুরু হয়েছিল এখন থেকে সাড়ে চার হাজার/সাড়ে তিন হাজার/তিন হাজার বছর আগে।

খ) লোহার ব্যবহার আরম্ভ করেছিল প্রথমে কৃষিজীবী মানুষরা/পশু-পালক মানুষরা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ ক ॥

বেবিলন

১. বেবিলনিয়ার প্রতিষ্ঠা—কৃষি, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি

মেসোপটেমিয়ায় সুমের অঞ্চলে যে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, তার কথা তোমরা পড়েছ। সুমেরের উর্বর ভূমি এব তার ধনসম্পদ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপজাতিগুলিকে প্রলুব্ধ করতো। আমোরাইট নামে একটি উপজাতি সুমেরের উত্তরে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে বেবিলনে এসে বসবাস করেছিল। এই উপজাতি ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠল। এই উপজাতির রাজা হামুরাবি সমগ্র মেসোপটেমিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করলেন। বেবিলনের অধীনে সমগ্র মেসোপটেমিয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় এখন এর নাম হ'ল বেবিলনিয়া।

এখন সমগ্র মেসোপটেমিয়া একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায় দ্রুত সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল।

পূর্বের মতোই মেসোপটেমিয়া কৃষিপ্রধান ছিল। এখন রাজভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকায় রাজাই কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় বাঁধ, খাল, সেচব্যবস্থা ইত্যাদি করতেন। কৃষিক্ষেত্রে এখন ব্যক্তিগত উদ্যোগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। সমগ্র মেসোপটেমিয়া একই শাসনাধীন হওয়ায় এবং সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করায় ব্যবসা-বাণিজ্যের খুবই উন্নতি হয়েছিল। বেবিলনীয়রা পার্শ্ববর্তী উপজাতিগুলির সঙ্গেও ব্যবসা করতো। উৎপন্ন দ্রব্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও অধিকার বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যেও ব্যক্তিগত উদ্যোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিনিময়ের মাধ্যমে বেশির ভাগ বাণিজ্য হ'লেও রূপাকেও অনেক সময় বিনিময়ের মাধ্যম ব'লে বিবেচনা করা হ'তো। তবে তখনও মুদ্রার প্রচলন হয় নি।

২. মন্দির—পুরোহিত সম্প্রদায়—জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতি

সুমেরে দেবতার উদ্দেশে বড় বড় মিনার ও মন্দির তৈরি করা হ'ত। এনলিল বা ভূ-দেবতা ছিলেন সুমেরীয়দের প্রধান দেবতা। বেবিলনীয়রাও

তাদের দেবতাদের জন্য মিনার ও মন্দির তৈরি করতো। তাদের প্রধান দেবতা ছিলেন বেল্‌মার্দুক বা সূর্যদেবতা।

পূর্বের মতোই পুরোহিতরা সমাজে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। তবে সুমেরীয় সভ্যতার যুগে পুরোহিতরা অনেক সময় রাজার মতোই শাসন-ক্ষমতারও অধিকারী হতেন। কিন্তু এখন দেবতার সেবা ও সন্তোষ সাধন এবং জ্ঞানচর্চাই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। দেবতার সন্তোষ সাধনের জন্য অনেক সময় মেষ বলি দেওয়া হ'তো। বেবিলনীয় পুরোহিতরা ঐ মেষের নাড়িভুঁড়ি দেখে নানারূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী করতেন। তাঁরা আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রাদি সম্পর্কে গবেষণা করতেন এবং দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের ফলে জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত নানা জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁরা রোগনিরাময়ের জন্য নানারূপ চিকিৎসাও করতেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে বেবিলনীয়রা খুবই উন্নতি করেছিল। তারা জ্যোতির্বিদ্যায়, গণিতে এবং ধাতু-শিল্পে খুবই উন্নতি করেছিল। বেবিলনীয়রা স্থাপত্য শিল্পে রোদে-পোড়া ও আগুনে পোড়া ইঁটই প্রধানত ব্যবহার করলেও তারা নির্মাণকার্যে অত্যন্ত সুপটু ছিল। নির্মাণকার্যে খিলানের ব্যবহার সম্ভবত তারাই প্রবর্তন করেছিল।

বেবিলনীয় মৃৎপাত্র

মৃৎশিল্পে তারা অতিশয় উন্নত ছিল। মৃৎপাত্রের গায়ে যে বর্ণসুষমা তারা ফুটিয়ে তুলতো, তার তুলনা নেই।

সুমেরীয়রা যে কীলকাকৃতি লিপি ব্যবহার করতো, বেবিলনীয়রা তার আরো উন্নতিসাধন করেছিল। ব্যবসা বাণিজ্যে, শাসনকার্যে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় লিপির ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঐ সকল অনেক লিপিই এখন পাওয়া গেছে। ঐ রকম একটি লিপি থেকেই আমরা হামুরাবির আইন-সংহিতার কথা জানতে পেরেছি।

৩. হামুরাবির আইন-সংহিতা

রাজা হামুরাবি সমগ্র মেসোপটেমিয়া জয় ক'রে কেবল একটি ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন নি—তিনি ঐ রাজ্যের সুশাসনের ব্যবস্থাও করে-

ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি সমগ্র সাম্রাজ্যে একই রকম আইন চালু করা। এজন্য তিনি দেশের আইনগুলি মার্দুকদেবের মন্দিরে একটি প্রস্তর ফলকে ক্ষোদিত ক'রে দিয়েছিলেন। এই লিপিবদ্ধ আইনগুলি **হামুরাবির আইন-সংহিতা** নামে পরিচিত। এই আইন-সংহিতাটিই পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন আইন-সংহিতা।

হামুরাবির আইন-সংহিতা চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছে সামাজিক আইনকানুন। এতে দেশবাসীকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে—স্বাধীন জনসাধারণ, আধা স্বাধীন জনসাধারণ এবং ক্রীতদাস। এতে এক-বিবাহকেই বৈধ ব'লে স্বীকার করা হয়েছে। সন্তানের উপর পিতার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। খাল-নালা ইত্যাদির সংরক্ষণের ভার ও দায়িত্ব ভূস্বামীদের দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে বিচার-ব্যবস্থা। আদালত, বিচারক-নিয়োগ, সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রভৃতি সম্পর্কে নিয়ম-কানুনের কথা এতে বলা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে আছে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের জন্য বিভিন্ন ধরনের দণ্ডের ব্যবস্থা। শাস্তির ক্ষেত্রে "চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত" —এই রকম প্রতিশোধমূলক নীতিই গৃহীত হয়েছে। চতুর্থ ভাগে আছে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন—এই আইন অনুসারে বিভিন্ন বৃত্তি ও কাজের জন্য মজুরি এবং বিভিন্ন বস্তুর দাম প্রভৃতি নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে। এই ভাগে বণিক্ সংগঠন, ঋণ দান, সুদের হার প্রভৃতি সম্পর্কেও আইন-কানুন আছে।

হামুরাবির আইন-সংহিতা থেকে সহজেই বেবিলনীয় সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

॥ খ ॥

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে মিশর

১. মিশরের সাম্রাজ্য বিস্তার

প্রাচীন মিশরে মোট একত্রিশটি রাজবংশ রাজত্ব করেছিল। দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ রাজবংশের শাসনকালে মিশরে বেশ বিশৃঙ্খলা চলেছিল। উত্তরের দিক থেকে অনেক উপজাতি দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে বসবাসের উপযুক্ত ভূমির সন্ধানে মিশরে পৌঁছেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে উত্তর থেকে হিক্‌সস্ নামে একটি দুর্ধর্ষ উপজাতি মিশরে প্রবেশ ক'রে আধিপত্য বিস্তার করে। হিক্‌সসরা লৌহাস্ত্র এবং অশ্বের ব্যবহার জানতো। মিশরীয়রা লৌহাস্ত্র ও অশ্বের ব্যবহার না জানায় সহজেই হিক্‌সসদের কাছে পরাজিত হয়। কিন্তু পরাজিত হ'লেও মিশরীয়রা এই বিদেশী শাসনকে

কখনো মনে-প্রাণে মেনে নেয় নি। তারা নিজেরা হিক্‌সসদের কাছ থেকে লৌহাস্ত্রের ও অশ্বের ব্যবহার শিখে নেয় এবং নিজেদের শক্তিশালী ক'রে তোলে। ক্রমেই মিশরীয়রা যুদ্ধবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে ওঠে। অবশেষে তারা হিক্‌সসদের মিশর থেকে বিতাড়িত করে। এইভাবে মিশর আবার স্বাধীন হয়।

হিক্‌সসদের বিতাড়িত করায় যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন; তিনিই মিশরে অষ্টাদশ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। অষ্টাদশ রাজবংশের ফারাওরা মিশরকে কেবল পুনরায় স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ করেন না, তাঁরা মিশরীয় সাম্রাজ্য স্থাপনেও উদ্‌যোগী হন। এ বিষয়ে এই রাজবংশের তৃতীয় খুতমসই সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ছিলেন। তাঁর কীর্তিকথা কারনাকের দেবমন্দিরের গায়ে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি দক্ষিণে নিউবিয়া ও ইথিওপিয়া পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন। তিনি সুদান, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার বিশাল অংশ এবং ঈজিয়ান সমুদ্রের দ্বীপসমূহ অধিকার করেন।

তৃতীয় খুতমসকে দিগ্‌বিজয়ী ফরাসী বীর নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তিনি কেবল বিশাল একটি সাম্রাজ্যই স্থাপন করেন না, তিনি এই সুবিশাল সাম্রাজ্যে দৃঢ় শাসনব্যবস্থাও গড়ে তোলেন। তিনি সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ রক্ষার জন্য বিশাল সামরিক বাহিনী ও নৌবাহিনী গড়ে তুলে-ছিলেন। উপনিবেশগুলি থেকে নিয়মিত রাজকর, খনিজ পদার্থ, মূল্যবান কাষ্ঠ প্রভৃতি সংগৃহীত হ'তো। উপনিবেশগুলিতে মাঝে মাঝে বিদ্রোহ দেখা দিলে তা কঠোর হস্তে দমন করা হ'তো। উপনিবেশগুলিতে মিশরীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি, লিপি, এমন কি ধর্মও প্রবর্তিত হয়।

তৃতীয় খুতমসের পরবর্তী কয়েকজন মিশরীয় সম্রাটের সময়েও মিশরের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকে। পরবর্তীকালে মেসোপটেমিয়ায় আসিরীয় সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের ফলে মিশর তার গৌরব হারায়।

২. পুরোহিত সম্প্রদায়ের শক্তি ও প্রাধান্য

পূর্বেই বলা হয়েছে, মিশরে বহু দেবদেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল। সাম্রাজ্যবাদের যুগে এইসব দেবদেবীর প্রাধান্য হ্রাস পায়। সমগ্র মিশরে এখন আমন-রা প্রধান দেবতারূপে পূজিত হ'তে থাকেন। ফারাওরা রাজধানী থিবিসের নিকটে কারনাকে আমন-রার মন্দির নির্মাণে অজস্র অর্থ ব্যয় করেন। ফারাওরা মিশরে দেবতার মর্যাদা পেলেও মিশরীয় সমাজে পুরোহিতদের প্রভাব ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। পুরোহিতরাই মন্দিরের সর্বময় কর্তা ছিলেন। জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার জন্য অজ্ঞ সাধারণ মানুষ তাঁদের বিস্ময়ের চোখে

দেখতো। তাঁরা জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত প্রভৃতিতে সামান্য জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। মন্দিরগুলিই ছিল বিদ্যাচর্চার স্থান। পুরোহিত সম্প্রদায় দেশের সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতেন। মন্দিরগুলি কেবল দেবালয় ছিল না, ছিল গ্রন্থাগার, চিকিৎসালয়। সাধার মানুষ তাদের বিপদে-আপদে মন্দিরে পুরোহিতদের শরণ নিতো। পুরোহিতদের মধ্য দিয়েই জনসাধারণের কাছে দেবতার অভিপ্রায় ব্যক্ত হ'তো। পুরোহিতরা ভবিষ্যদ্বাণীও করতেন। তাঁদের গভীর জ্ঞান ও সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী অনেক সময় সফলও হ'তো।

মিশরীয়রা দেবদেবীতে অতিশয় বিশ্বাসী হওয়ায় পুরোহিত শ্রেণীকে তারা ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভীতির চক্ষে দেখত। তাই মিশরে পুরোহিত শ্রেণীর আধিপত্য সকল সময়েই অক্ষুণ্ণ ছিল।

॥ গ ॥

ইরান বা পারস্যের অভ্যুত্থান

১. মিডি ও পারসিক উপজাতি : জরথুস্ত্র

মধ্য-এশিয়ার তৃণভূমিতে গৌরবর্ণ, উন্নতনাসা, দীর্ঘকায় একটি জাতির লোক বাস করতো। এদের বলা হয় এরিয়ান্স বা আর্য। এই জাতির লোকেরা জনসংখ্যাবৃদ্ধি, খাদ্যাভাব প্রভৃতি নানা কারণে দক্ষিণে, দক্ষিণ-পূর্বে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হ'তে থাকে। এদেরই একটি শাখা দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে মেসোপটেমিয়ার উত্তরে ও পূর্বে বসতি স্থাপন করে।

মেসোপটেমিয়ার পূর্বে মিডি ও পারসিক নামে দুই আর্য উপজাতি বসতি স্থাপন করে এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মেসোপটেমিয়ায় আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে টাইগ্রিস নদীর পূর্বদিকে মিডি উপজাতি একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করে। পারসিকরা তাদের সঙ্গেই তাদের দক্ষিণে পারস্যোপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। তারা মিডিদের অধীন ছিল। মিডি সাম্রাজ্য উত্তর-পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মিডি ও পারসিকরা একই ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। এই ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন জোরোএষ্টার বা জরথুস্ত্র। এই ধর্মমতে বলা হয়েছে, মানুষের জীবন ও ইতিহাস দুই শক্তির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে চালিত। একটি শক্তি শুভ ও আলোকের শক্তি ; অপর শক্তি অশুভ ও অন্ধকারের শক্তি। শুভ ও আলোকের শক্তি মাজ্দা বা আহুরমাজ্দার মধ্যে এবং অশুভ ও অন্ধকারের শক্তি আহ্রিমানের মধ্যে প্রতিভাত। জরথুস্ত্র তার স্বদেশ-

বাসীকে শুভ ও আলোকের শক্তির পক্ষেই জীবন নিয়োজিত করতে বলেন। শুভ ও আলোকের শক্তির প্রতীকরূপে মন্দিরে মন্দিরে পুরোহিত আগুন প্রজ্বলিত রাখেন। এক কথায়, মিডি ও পারসিকরা ছিলেন অগ্নি-উপাসক। এখনও ভারতে যে পারসিক বা পার্শী সম্প্রদায় আছেন, তাঁরাও এই নীতি অনুসারেই অগ্নি-উপাসনা করেন। জরথুস্ত্রের এই ধর্মনীতি ও শিক্ষা পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে। ঐ ধর্মগ্রন্থের নাম আবেস্তা বা জেন্দ্‌ আবেস্তা। আবেস্তার ভাব ও ভাষার সঙ্গে আমাদের বেদের ভাব ও ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে।

২ পারস্যের অভ্যুত্থান

প্রথমে মিডিদের বাসস্থান মিডিয়া ও পারসিকদের বাসস্থান পারস্য
আসিরীয় সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। মিডিয়া আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতনের
সুযোগে স্বাধীন হয় এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মিডিয়া পারস্য অধিকার
করে। কিন্তু এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে পারস্যের রাজা
স ইরাস মিডিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং মিডিয়া অধিকার ক'রে
পারসিক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি সমগ্র মেসোপটেমিয়া অধিকার
করেন। এশিয়া মাইনরের গ্রীক রাজ্য লিডিয়াও তাঁর অধিকার আসে।

সাইরাসের মৃত্যুর পর রাজা হন তাঁর পুত্র কাম্বিসিস।
কাম্বিসিস মিশর অধিকার করেন। এইভাবে পারসিক সাম্রাজ্য পশ্চিমে
ঈজিয়ান সাগর ও নীল নদের তীর থেকে পূর্বে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত
বিস্তৃত হয়।

কাম্বিসসের মৃত্যুর পর সাইরাসের মন্ত্রিপুত্র প্রথম দরায়ুস সম্রাট হন।
দরায়ুস ভারতবর্ষে অভিযান ক'রে সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চল অধিকার করেন।
এই ভারতীয় অঞ্চল পারসিক সাম্রাজ্যের বিংশ প্রদেশ ছিল এবং এশীয়
প্রদেশসমূহ থেকে সংগৃহীত রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ এই প্রদেশ থেকেই
সংগৃহীত হ'তো।

দক্ষিণে মিশর থেকে উত্তরে মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত দরায়ুসের সাম্রাজ্য বিস্তৃত
ছিল। দরায়ুস ঈজিয়ান সমুদ্রের তীরবর্তী গ্রীক রাজ্যগুলিও জয়
করেছিলেন। তিনি গ্রীসদেশ জয়েরও চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে সফল
হননি।

পারসিক সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল সুসা। পার্সেপলিস,
পাসারগাডে, সার্ডিস প্রভৃতি আরো অনেক বড় শহর ছিল পারস্য
সাম্রাজ্যে। সম্রাটরা সাম্রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখার জন্য সর্বত্র

বড় বড় রাজপথ নির্মাণ করেন। অশ্ব ও অশ্বচালিত রথের ব্যবহার সুপ্রচলিত হওয়ায় সাম্রাজ্যের সর্বত্র যোগাযোগ-ব্যবস্থা সুন্দর ছিল। পারস্য-সম্রাটগণ দেশে ডাক-ব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন। এশিয়া মাইনরের গ্রীক রাজ্য লিডিয়াই সর্বপ্রথম মুদ্রার প্রচলন করেছিল। পারস্য-সম্রাটরা মুদ্রার উপযোগিতা বুঝে সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যে মুদ্রার প্রচলন করেন। ফলে সারা সাম্রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। পারস্য অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি ও শক্তির অধিকারী হয়।

॥ ঘ ॥

ইহুদীগণ

১. ইহুদী জাতির মিশরে দাসত্ব—মোজেসের নেতৃত্বে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ

এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশকে সেতুর মতো যে উর্বর ভূখণ্ড যুক্ত করেছে, তার দক্ষিণ অংশের নাম প্যালেস্টাইন। অনাবৃষ্টি ও জলাভাবের দিনে পার্শ্ববর্তী মরু অঞ্চলগুলি থেকে এখানে লোকেরা দলে দলে এসে পৌঁছতো। প্যালেস্টাইনের উত্তরাংশের ভূমি বেশ উর্বর, কিন্তু বাকী অংশ চুনাপাথরের পাহাড়ে ভরতি। পাহাড়গুলি উর্বরভূমিকে খণ্ড খণ্ড ক'রে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে।

ইহুদীরা মূলত ছিল আরবদেশের লোক। পশুপালনই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। এরা যাযাবর ছিল এবং প্রায়ই বেবিলনিয়া ও প্যালেস্টাইনে এসে হানা দিতো। এখন থেকে কিছু কম সাড়ে তিন হাজার বছর আগে এরা প্যালেস্টাইনে এসে বসবাস করে।

এদের একটি শাখা সম্ভবত হিক্সসদের মিশর আক্রমণের কালে মিশরে গিয়েছিল। হিক্সসদের আনুকূল্য পেয়ে এরা মিশরে বেশ প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিল। হিক্সসদের শাসনকালে জোসেফ নামে এক ইহুদী মিশরের প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদও পেয়েছিলেন। তাঁর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ফারাওয়ের পরেই ছিল।

মিশরীয়রা বিদেশী হিক্সসদের যেমন ঘৃণা করতো, তেমনি ঘৃণা করতো তাদের সাহায্যকারী ইহুদীদের। মিশরীয়রা বিদেশী হিক্সসদের বিতাড়িত ক'রে যখন আবার স্বাধীন হ'লো, তখন তারা ইহুদীদের উপর নানাভাবে নির্যাতন শুরু করলো। অবশেষে ইহুদীরা পরিণত হ'লো ক্রীতদাসে। মিশরে ইহুদীদের দুঃখ-দুর্দশার সীমা রইলো না।

এই সময় ইহুদীদের মধ্যে মোজেস বা মুশা নামে এক নেতার আবির্ভাব

ঘটলো। তিনি ইহুদীদের ঐক্যবদ্ধ ক'রে তুললেন এবং তাদের ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত ক'রে মিশরের বাইরে আনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা যাতে মিশর থেকে পালাতে না পারে, সেজন্য সর্বত্র পাহারার ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন কাহিনীতে বলা হয়েছে, মোজেস যখন ইহুদীদের নিয়ে লোহিত সাগরের তীরে এসে পেঁছিলেন, তখন ফারাও সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাদের ধরবার জন্য তাদের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে এসে পেঁছিলেন। মোজেস তাঁর যাদুদণ্ড দুলিয়ে লোহিত সাগরকে দ্বিধা হওয়ার জন্য আদেশ করলেন। লোহিত সাগরের জল দুপাশে সরে গেল এবং মাঝখানের রাস্তা দিয়ে ইহুদীরা লোহিত সাগরের অপর পারে গিয়ে পেঁছিলো। ঐ পথ দিয়ে ফারাও তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে ইহুদীদের অনুসরণ করছিলেন। ঐ সময়ে মোজেসের নির্দেশে সমুদ্রের জল তার পূর্বস্থানে ফিরে গেল। ফলে ফারাও ও তাঁর সৈন্যসামন্ত সমুদ্রের জলে ভেসে গেল।

মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদীরা অবশেষে প্যালেস্টাইনে ফিরে এল। কিন্তু প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন খুব নিরাপদ ছিল না। এজন্য ইহুদীদের অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ইহুদীরা সফল হয়েছিল এবং তাদের রাজা **সল**, **ডেভিড** ও **সলোমনের** সময়ে অভূতপূর্ব শক্তি ও গৌরবের অধিকারী হয়েছিল।

২. মুশার বাণী— ইহুদীদের ধর্ম

মোজেস বা মুশা কেবল ইহুদীদের মিশরে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত করেন নি, তিনি ছিলেন তাদের ধর্মগুরুও। ইহুদীরা নিজেদের আব্রাহামের বংশধর ব'লে দাবী করে। আব্রাহাম যে দেবতার উপাসনা করতেন, তাঁর নাম **জিহোভা**। মুশা নিজেকে এই জিহোভার বাণীবাহক ব'লে প্রচার করেন। তিনি বলেন, জিহোবা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি নিরাকার। বলা চলে, মুশাই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে নিরাকার ও একেশ্বরবাদী ধর্মমত প্রচার করেন। এই ধর্মমতের দ্বারা পরবর্তীকালে খৃষ্টধর্ম ও ইসলাম ধর্ম গভীরভাবে প্রভাবিত হয়।

কথিত আছে, জিহোভার নির্দেশে মোজেস এক অতি উচ্চ পর্বতে আরোহণ করেন। তিনি সেখানে প্রচণ্ড ঝড়-বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতের মধ্যে দুটি প্রস্তরফলক পান। ঐ দুটি প্রস্তরফলকে জিহোভার দশটি নির্দেশ বা অনুশাসন লিপিবদ্ধ ছিল। এই অনুশাসনগুলি হ'ল—(১) পিতামাতাকে ভক্তি ক'রো; (২) হত্যা ক'রো না; (৩) দুশ্চরিত্র হয়ো না; (৪) চুরি ক'রো না; (৫) মিথ্যা সাক্ষী দিও না; (৬) প্রতিবেশীর কোনো কিছুতে লোভ ক'রো না;

(৭) মূর্তিপূজা ক'রো না ; (৮) ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় ; (৯) বৃথা—অর্থাৎ ভণ্ডামী ক'রে—ঈশ্বরের নাম নিও না ; (১০) পবিত্র কাজের জন্য সপ্তাহে একটি দিন নির্দিষ্ট রেখো।

ইহুদীদের ধর্মকথা বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

অনুশীলনী

১

১। বেবিলন কোথায়। বেবিলনীয়া বলতে কি বোঝ?

২। বেবিলনীয়ার কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য সম্পর্কে কি জান?

৩। হামুরাবি সম্পর্কে যা জান লিখ।

৪। হামুরাবির আইন-সংহিতা কি? এটি ক' ভাগে বিভক্ত? এতে কি কি সম্পর্কে বিভিন্ন আইনকানুন আছে?

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) — নদীর তীরে সুমেরের — বেবিলন শহর অবস্থিত।

(খ) বেবিলনের প্রধান দেবতা ছিলেন —।

(গ) বেবিলনকে প্রথম শক্তিশালী ক'রে তোলেন —।

(ঘ) পৃথিবীর প্রাচীনতম আইন-সংহিতা হ'ল — -র আইন-সংহিতা।

২

১। হিক্সস জাতি সম্পর্কে কি জান? তারা মিশরে কতদিন রাজত্ব করেছিল? মিশরীয়রা কিভাবে তাদের বিতাড়িত করেছিল?

২। কাকে মিশরের নেপোলিয়ন বলা হয়? কেন বলা হয়?

৩। মিশরীয় সাম্রাজ্য ও উপনিবেশগুলি সম্পর্কে যা জান লিখ।

৪। মিশরে পুরোহিত শ্রেণীর মর্যাদা ও ক্ষমতা কিরূপ ছিল?

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) হিক্সসদের মিশরীয়রা বলত — রাজা।

(খ) তৃতীয় তুতমিসকে বলা হ'ত মিশরের —।

(গ) হিক্সসরা — ও — ব্যবহার জানত।

৩

১। পারসিকরা কোন্ জাতির লোক ছিল? তারা কোথা থেকে এসে কোথায় বসতি স্থাপন করেছিল?

২। মিডিদের সঙ্গে পারসিকদের কি সম্পর্ক ছিল?

৩। কে পারসিক সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন ? তাঁর সম্পর্কে যা জান লিখ।

৪। উত্তর-পশ্চিম ভারত কার সময়ে পারস্যের অধীন হয় ? ঐ অঞ্চল পারস্য সাম্রাজ্যের কোন্ প্রদেশ ছিল ? ঐ প্রদেশ থেকে পারস্য সম্রাটের রাজকোষে কিরূপ অর্থ আসত ?

৫। দরায়ুস কে ছিলেন ? তিনি কিভাবে পারস্য সম্রাট হন ? তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে যা জান লিখ।

৬। পারসিকদের ধর্ম সম্পর্কে যা জান লিখ।

৭। টীকা লিখ : জরথুস্ত্র ; আবেস্তা ; পার্শী।

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) পৃথিবীতে প্রথম মুদ্রা প্রচলিত হয় — রাজ্যে।

(খ) পৃথিবীতে প্রথম ডাক-ব্যবস্থা চালু করেন — সম্রাটরা।

(গ) পারসিকদের ধর্ম প্রবর্তন করেন —।

(ঘ) পারসিকদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম —।

(ঙ) মুসলিম আক্রমণকালে যেসব পারসিক ভারতে চলে এসেছিলেন, তাঁদের বলা হয় —।

৪

১। ইহুদীদের আদি-বাসস্থান কোথায় ছিল ? তারা কেন মিশরে গিয়েছিল ?

২। মিশরে তাদের বন্দী ক্রীতদাসের অবস্থা হয়েছিল কেন ?

৩। কে তাদের কি ভাবে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেছিল।

৪। মিশর থেকে ইহুদীদের পলায়নের প্রচলিত কাহিনীটি লিখ ?

৫। মুশা ইহুদীদের মিশর থেকে কোথায় এনেছিলেন ?

৬। ইহুদীদের দেবতার নাম কি ? তিনি কি দশটি আদেশ বা অনুশাসন দিয়েছিলেন ?

৭। ঠিক উত্তরের নিচে দাগ দাও :

(ক) হিক্সসদের সঙ্গে ইহুদীদের সৌহার্দ্য ছিল/ছিল না।

(খ) ইহুদীদের দেবতার নাম জিউস/জিহোভা/মার্দুক।

(গ) মিশরে বন্দীদশা থেকে ইহুদীদের মুক্ত করেছিলেন ঈশা/মুশা/হামুরাবি।

৮। হামুরাবি কে ছিলেন ?

৯। হামুরাবির আইন-সংহিতা কয়ভাগে বিভক্ত ?

১০। ফরাসী বীর নেপোলিয়নের সঙ্গে কার তুলনা করা হয় ?

১১। মেসোপটেমিয়ার পূর্বে কোন্ দুইটি আর্য উপজাতি বসতি স্থাপন করেন ?

১২। ইহুদীদের ধর্মকথা কোন্ পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে।

১৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) পারসিক ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন —।

খ) শুভ ও আলোকের শক্তি হল —।

গ) সাইরাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র — রাজা হন।

১৪। সঠিক উত্তরের পাশে (✓) চিহ্ন দাও ঃ

ক) পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল—মিশর, সুসা, সার্ভিস।

খ) ইহুদীদের নেতার নাম—সলোমন, মুশা, ডেভিড।

গ) ইহুদীদের ধর্মকথা লেখা আছে—কোরানে, ত্রিপিটকে, ওল্ড টেস্টামেন্টে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন গ্রীসদেশ

১. গ্রীস ও ক্রীটান সভ্যতা

গ্রীকরা মিডি ও পারসিকদের মতোই আর্যজাতির লোক। মধ্য-এশিয়া থেকে দক্ষিণে আর্যজাতির যে শাখা অগ্রসর হচ্ছিল, তাদেরই একটি শাখা গ্রীসদেশে বসতি স্থাপন করে।

গ্রীসদেশটি ঈজিয়ান সমুদ্রের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত উপদ্বীপ এবং ঈজিয়ান সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত দ্বীপসমূহ নিয়ে গঠিত। গ্রীসের প্রধান

ভূখণ্ডটি একটি উপদ্বীপ। এই উপদ্বীপের দক্ষিণাংশের নাম পেলোপনেসাস। পেলোপনেসাস উত্তর ও মধ্য গ্রীস থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন—কেবল মাত্র সংকীর্ণ করিন্থ যোজকের দ্বারা যুক্ত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রীক উপজাতির লোকেরা গ্রীসে এসে বসতি স্থাপন করেছিল।

ঈজিয়ান সমুদ্রের দক্ষিণ প্রান্তে একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ আছে। এই দ্বীপের নাম ক্রীট। গ্রীকদের গ্রীসদেশে আসার বহু পূর্বেই এখানে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। এখানকার সভ্যতা-সংস্কৃতি মেসোপটেমিয়া ও মিশরের সভ্যতার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। চারিদিকে সমুদ্র-বেষ্টিত হওয়ায় এই দ্বীপবাসী লোকেরা নৌ-অভিযানে ও সামুদ্রিক বাণিজ্যে সুনিপুণ হয়ে উঠেছিল। নৌ-বাণিজ্য ক'রে ক্রীট অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিল। ক্রীটের রাজধানী ছিল **নোসস্**।

ক্রীটের সভ্যতা গ্রীসের উপর সহজেই প্রভাব-বিস্তার করেছিল। সমুদ্রাগত কোনো বৈদেশিক আক্রমণে ক্রীটের এই সভ্যতা বিধ্বস্ত হয়েছিল মনে হয়। তখন তার স্থান অধিকার করেছিল গ্রীসের দক্ষিণ ভূখণ্ড বা **পেলোপনেসাস**। পেলোপনেসাসের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রধান ছিল **মাইসেনি**।

২. হোমার-বর্ণিত গ্রীস—হোমারীয় যুগ

মাইসেনি নগরটি অবস্থিত ছিল গ্রীসের দক্ষিণ ভূখণ্ড পেলোপনেসাসের উত্তর-পূর্ব কোণে। আর **ট্রয়** ছিল এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম কোণে। মাঝখানে ছিল ঈজিয়ান সমুদ্র। মাইসেনির প্রাধান্য সমস্ত গ্রীক রাজ্যগুলিই স্বীকার করতো। মাইসেনির রাজা গ্রীসে রাজাধিরাজরূপে পরিচিত ছিলেন। মাইসেনি ছিল গ্রীকদের কাছে স্বর্ণময়ী পুরী।

এই সময় ঈজিয়ান সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত রাজ্যগুলির মধ্যে প্রধান ছিল ট্রয়। ট্রয়ের মতো সুরক্ষিত নগরী সেকালে আর ছিল না। এর চতুর্দিকে ছিল পনেরো ফুট প্রশস্ত প্রাচীর। তাতে ছিল বড় বড় তোরণ ও সুউচ্চ মিনার। এই প্রাকারের উপরে যে অলিন্দ ছিল, তা ছিল রাজপথের মতো প্রশস্ত। ট্রয়ের সোনা ও ব্রোঞ্জ ছিল কাহিনী-কিংবদন্তীর বস্তু।

ফলে মাইসেনি ও ট্রয়ের মধ্যে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। শেষ পর্যন্ত এদের যুদ্ধ ঘটেছিল একটি পারিবারিক ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে। ট্রয়ের রাজা **প্রায়ামের** পুত্র **প্যারিস** পেলোপনেসাসে স্পার্টায় বেড়াতে এসেছিলেন। সেখানে রাজত্ব করতেন মাইসেনির রাজা **আগামেম্‌ননের** ভাই **মেনেলস**। প্যারিস মেনেলসের গৃহে অতিথি হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে মেনেলসের রূপবতী পত্নী **হেলেনকে** অপহরণ করেন। এই অপমানে গ্রীকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং রাজা আগামেম্‌ননের নেতৃত্বে ট্রয় আক্রমণ করে।

গ্রীকরা দুর্ধর্ষ বীর হ'লেও সুরক্ষিত ট্রয় নগরী ধ্বংস করা সহজ ছিল না। দশ বৎসর ধ'রে যুদ্ধ চলে। শেষে গ্রীকরা যুদ্ধ ত্যাগ ক'রে ফিরে যাওয়ার ভান করে এবং ট্রয় নগরীর তোরণের কাছে একটি বিশাল কাঠের ঘোড়া রেখে যায়। ঐ ঘোড়ার ভেতরে গ্রীক সৈন্যরা লুকিয়েছিল। ট্রয়ের লোকেরা ঘোড়াটিকে শহরের মধ্যে নিয়ে এলে রাত্রিতে গ্রীক সৈন্যরা ঘোড়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে ট্রয় নগরীর তোরণ খুলে দেয়। তখন সমুদ্র বক্ষ থেকে অগণিত গ্রীক সৈন্য ট্রয় নগরে প্রবেশ করে। ট্রয় নগরের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং গ্রীকরা ট্রয় নগর ধ্বংস করে।

ট্রয়ের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে গ্রীকরা দেশের সমুজ্জ্বল গৌরব বলে মনে করে। গ্রীক রাজাদের রাজসভায় ও আনন্দ-উৎসবে গ্রীক কবিরা এই যুদ্ধের কাহিনী গেয়ে গ্রীকদের বীরত্বগাথা প্রচার করতেন। এখন থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে ট্রয় নগর ধ্বংস হয়েছিল। এর তিনশ বছর পরে গ্রীসের এক মহাকবি ট্রয় যুদ্ধ সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী-কিংবদন্তীগুলি নিয়ে দুখানি মহাকাব্য রচনা করেন। এই মহাকবির নাম **হোমার**। মহাকাব্য দুটির নাম **ইলিয়াড** ও **ওডিসি**। মহাকবি হোমার অন্ধ ছিলেন। তাঁর রচিত এই মহাকাব্য দুটি পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন মহাকাব্য।

হোমারের মহাকাব্য দুটি থেকে প্রাচীন গ্রীকদের সমাজ-সভ্যতা সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। কৃষি, পশুপালন এবং নৌ-বাণিজ্যে তারা খুবই উন্নত ছিল। রাজারাও সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করতেন। রাণীকে স্বহস্তে গৃহকর্ম করতে হ'তো। রাজার গৃহগুলির গঠন সাধারণ হ'লেও তা সোনায়, রুপায় ও ব্রোঞ্জে সুসজ্জিত থাকতো। রাজাদের অনেকের দেবতার অংশে জন্ম ব'লে লোক বিশ্বাস করতো। গ্রীক দেশে বহু দেব-দেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল। রাজারা সকলেই বিশেষ বিশেষ দেবতার প্রসন্নতা ও আনুকূল্যের অধিকারী ছিলেন। গ্রীকরা চাষ করত, পশুপালন করত, শিকার করত। তারা রুটি, মাংস ও মদ খেত, খুব ভোজনবিলাসী ছিল। রাজপ্রাসাদে উৎসব লেগেই থাকতো, কবিরা গান গেয়ে শোনাতেন, সকলে প্রচুর পানাহার করত। তাদের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র ছিল বর্শা, তারা শিরস্ত্রাণ ও বর্ম পরত। তারা কাঠের ওপর ষাঁড়ের চামড়া শক্ত ক'রে এঁটে ঢাল তৈরি করত। বীর যোদ্ধারা রথে চ'ড়ে যুদ্ধ করতেন। প্রধান প্রধান বীরদের মধ্যে দ্বৈরথ যুদ্ধ হ'তো।

গ্রীকরা বহু দেবদেবীর পূজা করতো। দেবদেবীরা বিশেষ বিশেষ শক্তির অধিকারী ছিলেন। গ্রীকরা বিশ্বাস করতো, তাঁরা উত্তর গ্রীসে **অলিম্পাস** পর্বতের সুউচ্চ চূড়ায় বাস করেন। এই দেবদেবীদের রাজা হলেন **জিউস**।

তিনি ছিলেন বজ্র-বিদ্যুৎ ও ঝড়ের দেবতা ; **পসিডন** হলেন সমুদ্র-দেবতা ; **অ্যাপলো** সঙ্গীত ও চিকিৎসার দেবতা ; **আরিস** যুদ্ধের দেবতা । **আথেনা** সকল কলা-শিল্পের দেবী । প্রাচীন গ্রীকরা বিশ্বাস করতেন, দেবদেবীরা

গ্রীক দেবদেবী—জিউস ও আথেনা

মানুষের মতোই দেহধারী, মানুষের মতোই ঈর্ষা, দ্বেষ ও ক্রোধের বশবর্তী । তাঁরা প্রার্থনায় তুষ্ট হন, অবহেলায় ক্রুদ্ধ হন । প্রাচীন গ্রীকরা দেবতার উদ্দেশে বৃষ ও মেষ বলি দিতো ।

৩. গ্রীক নগর-রাষ্ট্র

গ্রীকরা নিজেদের একজাতি ব'লে গণ্য করলেও গ্রীসের ভূখণ্ডের গঠন তাদের কখনো একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হ'তে দেয়নি । গ্রীস দেশটা পর্বতে ও সমুদ্রে ছিল পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন । পর্বতমালার মধ্য দিয়ে সংকীর্ণ দুর্গম গিরিপথ এবং সমুদ্রের জলপথই ছিল এদের যোগাযোগের প্রধান উপায় । তাই গ্রীক উপজাতিগুলি এক-একটি পর্বত এবং সেই পর্বতের পাশের উর্বরভূমিকে কেন্দ্র ক'রে নিজ নিজ জনপদ গ'ড়ে তুলেছিল । এই বিচ্ছিন্ন জনসমাজগুলি এক-একটি **নগর-রাষ্ট্রে** পরিণত হয়েছিল । পর্বতের উচ্চতম অংশটিই ছিল এইসব জনসমাজ ও নগর-রাষ্ট্রের কেন্দ্র । এটিই

ছিল তাদের রাজধানী ও দুর্গ। এটিকে গ্রীক ভাষায় বলা হ'তো অ্যাক্রোপলিস।

নগর-রাষ্ট্রগুলির নাগরিকরা এই অ্যাক্রোপলিস বা রাজধানীর আশেপাশে বাস করতো। তাই তারা জনজীবন ও রাজ্যের পরিচালনায় সকলেই অংশ নিতে সমর্থ হ'তো। এক-একটি নগর-রাষ্ট্রের জনসংখ্যা অল্প হওয়ায় এতে অসুবিধাও হ'তো না। ক্রীতদাস ও স্ত্রীলোকদের নাগরিক মনে করা হ'তো না।

গোড়ার দিকে রাজাই দেশ শাসন করতেন। কিন্তু রাজারা ক্রমেই তাঁদের প্রাধান্য হারিয়ে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন এবং নগর-রাষ্ট্রের নাগরিকরাই হয়ে উঠেছিল রাষ্ট্রের শাসক। এইভাবে গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলিতে ক্রমে প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

গ্রীসে প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলিতে তিন শ্রেণীর লোক বাস করতো—ধনী নাগরিক, সাধারণ নাগরিক এবং ক্রীতদাস। ক্রীতদাসদের রাষ্ট্রব্যবস্হায় অংশ গ্রহণের অধিকার ছিল না। সাধারণ নাগরিকরা রাষ্ট্রব্যবস্থায় অংশ নেওয়ার অধিকারী হ'লেও শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতেন অভিজাত শ্রেণী।

গ্রীস দেশে বহু নগর-রাষ্ট্র থাকলেও মধ্য-গ্রীসের আথেন্স এবং দক্ষিণ-গ্রীসের (পেলোপনেসাস) স্পার্টা প্রধান দুটি নগর-রাষ্ট্র ছিল। এদের মধ্যে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, তেমনি ছিল তাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি ও আদর্শের মধ্যে পার্থক্য।

বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রের গ্রীকরা সকলেই কিন্তু নিজেকে গ্রীক মনে করত। গ্রীকদের ভাষা ধর্ম এক হওয়ায় নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহজেই সংস্কৃতির বিনিময় হ'তো। এইভাবে একটি ঐক্যবদ্ধ গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠেছিল।

৪. গ্রীক উপনিবেশসমূহ

দেশে এক শ্রেণীর দরিদ্র ও বিক্ষুব্ধ মানুষের উদ্ভব হয়েছিল। জনসংখ্যাও দ্রুত বাড়ছিল। গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলি দরিদ্র মানুষের বিক্ষোভ ও জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সমস্যা সমাধানের জন্য দেশের বাইরে উপনিবেশ স্হাপনে উদ্যোগী হয়েছিল। রাষ্ট্রগুলি কোনো জনপ্রিয় নেতার অধীনে একদল স্ত্রী-পুরুষকে সমুদ্রপারে কোনো নির্বাচিত স্হানে পাঠিয়ে দিতো। তারা সেই স্হানে গিয়ে উপনিবেশ স্হাপন করতো। উপনিবেশগুলি রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন থাকতো, কিন্তু গ্রীসে অবস্হিত নিজ নিজ নগর-রাষ্ট্রের সঙ্গে

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতো। এইসব উপনিবেশের সঙ্গে নগর-রাষ্ট্রগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো।

গ্রীকরা ঈজিয়ান সমুদ্রের পূর্ব উপকূলে, ভূমধ্যসাগরের তীরে, কৃষ্ণসাগরের তীরে এবং সাইপ্রাস, সিসিলি ও কর্সিকায় উপনিবেশসমূহ গ'ড়ে তুলেছিল।

গ্রীসের বাইরে এইভাবে অসংখ্য গ্রীক উপনিবেশ গ'ড়ে ওঠায় গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতি এক সুবিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এইসব উপনিবেশে বহু বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের জন্ম হয়েছিল। গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব থাকায় গ্রীক উপনিবেশগুলির মধ্যেও বিরোধ ও দ্বন্দ্ব ছিল। তাই গ্রীস ও গ্রীক উপনিবেশগুলি কখনও ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারে নি।

৫. আথেন্স ও স্পার্টা

স্পার্টাঃ গ্রীক উপজাতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে যারা শক্তিশালী ছিল, তারা দক্ষিণ গ্রীসে স্পার্টায় বসতি স্থাপন করেছিল। তারা স্থানীয় অধিবাসীদের পদানত ক'রে ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। এইসব ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল স্পার্টানদের চেয়েও অনেক বেশি। শেষ পর্যন্ত এই ক্রীতদাসরা বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ দমন করলেও স্পার্টানরা সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে এবং সঙ্গীত, কাব্য ও কলাশিল্পকে দুর্বলতা জ্ঞানে ত্যাগ ক'রে কেবল যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করে।

পুরুষদের জন্ম থেকেই সৈনিকের জীবনের জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'তো। শিশু দুর্বল হলে তাকে ফেলে দেওয়া হতো। মেয়েরা যাতে বীর সন্তানের জননী হ'তে পারে, সেজন্য তাদেরও দৈহিক শক্তির অধিকারী হ'তে হ'তো। সাত বছর বয়স থেকে ছেলেদের সৈন্যাবাসে থাকতে হ'তো। সেখানে কঠোর শৃঙ্খলা, শরীরচর্চা সহিষ্ণুতা অর্জন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হ'তো। তাদের বুদ্ধিমান ক'রে তোলার জন্য চুরি-ও শিক্ষা দেওয়া হ'তো। বলা হ'তো, চুরি অপরাধ নয়, ধরা পড়াই অপরাধ। তাদের মন থেকে সকল সুকুমার বৃত্তি নষ্ট করে দেওয়া হ'তো। পরিণত বয়সে তাদের সামরিক জীবন গ্রহণ করতে হ'তো। কৃষিকার্য, শিল্পকার্য, ব্যবসায় প্রভৃতি সবই তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। ঐসব কাজ করতো ক্রীতদাসরা। সাহস, শক্তি, কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতাই তাদের জীবনের একমাত্র কাম্য ছিল।

স্পার্টায় একসঙ্গে দুজন রাজা রাজত্ব করতেন। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে একজন রাজা যুদ্ধ চালাতেন অন্য রাজা রাষ্ট্র শাসন করতেন।

আথেন্স ঃ আথেন্স নগর-রাষ্ট্রটি মধ্য গ্রীসে অবস্থিত ছিল। গ্রীসের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছিল আথেন্স। আথেন্সবাসীরা স্পার্টানদের মতো কেবল যুদ্ধবিদ্যাকেই জীবনের সার মনে করে নি। সংগীত, কাব্য, শিল্পকলা, সবই এখানে বিকাশ পেয়েছিল। প্রাচীন গ্রীসের ধর্মকেও এরা আগলে রেখেছিল। আথেন্স নগরী দেবদেবীর মূর্তিতে ও মন্দিরে পূর্ণ ছিল। আথেন্সে ক্রীতদাস থাকলেও তা স্পার্টার মতো এত অধিক সংখ্যায় ছিল না। এখানে স্বাধীন নাগরিকরাও কৃষিকার্য, শিল্পকার্য প্রভৃতি করতো। এখানে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। স্বাধীন নাগরিকদের শাসনব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের সুযোগ ছিল অনেক বেশি। অবশ্য, এখানেও প্রতিভাধর শক্তিমান্ পুরুষরা অনেক সময় রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হয়ে উঠতেন। তাঁরা আথেন্সের সমৃদ্ধির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। তাঁদের বলা হ'ত **টাইরেণ্ট**।

পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধ ঃ পারস্য-সম্রাটরা এশিয়া মাইনরে অবস্থিত গ্রীক উপনিবেশগুলি অধিকার ক'রে নিয়েছিলেন। গ্রীক উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ করলে আথেন্স তাদের সাহায্য করেছিল। তাই পারস্য-সম্রাট দরায়ুস বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আথেন্স আক্রমণ করেন। এই সৈন্যবাহিনী একটি ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র ধ্বংসের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আথেন্স সহজে পরাজয় স্বীকার করলো না। পারসিক বাহিনী গ্রীসে অবতরণ করলে আথেন্সের এক বীর সেনানী—**মিল্‌টিয়াডিস্**—কয়েক হাজার মাত্র সৈন্য নিয়ে ম্যারাথনে পারসিক বাহিনীকে বাধা দিলেন। গ্রীক সৈনিকদের বর্শার আঘাতে হাজারে হাজারে পারসিক সৈন্য প্রাণ হারালো। অবশিষ্টরা জাহাজে ক'রে পালিয়ে গেল। এইভাবে দরায়ুসের আথেন্স অভিযান ব্যর্থ হ'লো। এই যুদ্ধজয়ের সংবাদ ম্যারাথন থেকে আথেন্সে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটানা একটি যুবক পঁচিশ মাইল ছুটে গিয়েছিল। ঐ যুবকটি আথেন্সে পৌঁছে যুদ্ধজয়ের সংবাদ জানিয়েই প্রাণত্যাগ করে। এই দৌড়ের স্মরণেই 'ম্যারাথন দৌড়' প্রতিযোগিতা প্রবর্তিত হয়েছে।

দরায়ুসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সম্রাট জেরেক্সিস্ বিপুল বাহিনী নিয়ে দার্দানেলেস্ প্রণালীর পথে আথেন্স আক্রমণ করেন। কেবল আথেন্স নয়, সমগ্র গ্রীকদেশের স্বাধীনতা বিপন্ন বুঝে স্পার্টানরাও আথেন্সের সাহায্যে অগ্রসর হয়। স্পার্টার রাজা লিওনিডাস সামান্যসংখ্যক সৈন্য নিয়ে থার্মোপাইলির গিরিপথে পারসিক বাহিনীকে বাধা দেন। তাঁদের হাতে অসংখ্য পারসিক সৈন্য নিহত হয়। প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে স্পার্টান বীর লিওনিডাস যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। এদিকে আথেন্সের নৌবাহিনী নৌ-

যুদ্ধে জেরেক্‌সিসের নৌবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে। পারসিকরা আথেন্সের হাতে চূড়ান্তরূপে পরাজিত হয়।

ফলে সমগ্র গ্রীসদেশে ও তার উপনিবেশসমূহে আথেন্সের প্রভাব ও মর্যাদা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। আথেন্স এখন নৌশক্তিতে দুর্জয় হয়ে ওঠে। আথেন্সের নেতৃত্বে বহু গ্রীক নগর-রাষ্ট্র ও উপনিবেশসমূহের একটি সংঘ স্থাপিত হয়। আথেন্স কেবল সামরিক শক্তিতে দুর্জয় হয়ে ওঠে না। সে অতুল সম্পদেরও অধিকারী হয়।

কিন্তু আথেন্সের এই গৌরবময় যুগ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আথেন্সের শক্তি, সমৃদ্ধি ও গৌরবে তার চিরশত্রু স্পার্টা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল। অবশেষে স্পার্টা দক্ষিণ গ্রীসের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাহায্যে আথেন্সকে আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হ'লো। এইরূপ আক্রমণের আশংকা আথেন্সের রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিস করেছিলেন। আথেন্সের দুর্ভাগ্য, এই সময়ে আথেন্সে ভয়ংকর মহামারী দেখা দিল। এই মহামারীর পর পেরিক্লিসেরও মৃত্যু হ'লো। আথেন্সবাসীরা কেবল জনবল হারালো না, প্রিয়তম নেতার মৃত্যুতে হতোদ্যম হয়ে পড়ল। তবু আথেন্সবাসীরা স্পার্টার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালিয়ে গেল। এই যুদ্ধ পেলোপনেসীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত। স্পার্টা জয়ী হ'ল। কিন্তু দীর্ঘকাল এইভাবে যুদ্ধ চলার ফলে আথেন্স ও স্পার্টা উভয়েই দুর্বল হয়ে পড়লো।

৬. আথেন্সের স্বর্ণযুগ—পেরিক্লিস

দেশে গণতন্ত্র প্রচলিত থাকলেও এখন আথেন্সে সামরিক নেতাদের প্রাধান্য ছিল সবচেয়ে বেশি। পেরিক্লিস নামে একজন জনপ্রিয় সেনাপতি আথেন্সের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল আথেন্সের সর্বময় কর্তা ছিলেন। পেরিক্লিস পর পর ছ'বার ঐ পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর শাসনকালে আথেন্স গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল। পেরিক্লিস কেবল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এবং অতিশয় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও জনপ্রিয় শাসকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিল্প-সাহিত্যের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। ফলে তাঁর সময়েই গ্রীসদেশ বিজ্ঞানে, দর্শনে,

পেরিক্লিস

সাহিত্যে এবং শিল্পকলায় সর্বাধিক উন্নতি লাভ করেছিল। তিনি সমস্ত গ্রীস ও গ্রীসের উপনিবেশসমূহ থেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের আথেন্সে আনেন এবং তাঁর নিজের ভাষায়, আথেন্সকে 'গ্রীসের শিক্ষালয়ে' পরিণত করেন।

তাঁর সময়েই গ্রীসদেশে নাট্যসাহিত্যের বিস্ময়কর বিকাশ হয়েছিল। ইস্‌কাইলাস. ইউরিপিদিস, সফোক্লিস প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক নাট্যকাররা এইযুগেই জন্মেছিলেন। এই যুগেই পৃথিবীতে প্রথম ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হয়েছিল। পৃথিবীর প্রথম দুই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হেরেডটাস ও থুকিদিদিস এই যুগেই জন্মেছিলেন। হোরোডটাসকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। তিনি পারস্যের সঙ্গে গ্রীসের যুদ্ধ সম্পর্কে একটি বৃহৎ ইতিহাস রচনা করেন। সক্রেতিস ও প্লেটোর মতো শ্রেষ্ঠ গ্রীক দার্শনিকরাও এই যুগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সক্রেতিস প্রশ্নোত্তরের ছলে তাঁর দার্শনিক মত প্রচার করতেন। তাঁর চিন্তাধারা তাঁর শিষ্য প্লেটো লিখে রেখে গেছেন। সক্রেতিসকে শেষ বয়সে রাজরোষে পড়তে হয় এবং বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। তিনি হেমলক্ নামে এক বিষাক্ত লতার রস পান ক'রে মৃত্যুবরণ করেন।

সক্রেতিস

হেরোডটাস

গ্রীসদেশ এই সময়ে স্থাপত্য বা গৃহনির্মাণশিল্পে এবং ভাস্কর্যে বা মূর্তিনির্মাণশিল্পেও অসাধারণ উন্নতি লাভ করেছিল। ফিডিয়াস আথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আথেনার ব্রোঞ্জের যে মূর্তিটি তৈরী করেছিলেন,

তার তুলনা নেই। আথেনা দেবীর মন্দির পার্থেনন নির্মাণ করেছিলেন ইক্‌টিনাস নামে এক স্থপতিকর।

৭. মাসিডন—আলেকজাণ্ডার

মাসিডন ঃ গ্রীসদেশের উত্তরে মাসিডন নামে একটি রাজ্য ছিল। মাসিডন রাজ্যের অধিবাসীরা গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছিল এবং নিজদিগকে গ্রীক ব'লেই মনে করতো। মাসিডনের রাজা ফিলিপ গ্রীক শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছিলেন এবং গ্রীকনগর-রাষ্ট্র থিবিসে থেকে যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিলেন। গ্রীক সভ্যতাসম্পর্কে তাঁর অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। তাই তিনি রাজা হয়ে গ্রীক জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে একটি গ্রীক সাম্রাজ্য স্থাপনের সংকল্প করলেন। ফিলিপ বিশাল সৈন্যবাহিনী গ'ড়ে তুললেন। তিনি প্রথমে উত্তরের উপজাতিগুলিকে পদানত করলেন।

ফিলিপের শক্তিবৃদ্ধিতে গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলিতে নানারকম মনোভাব দেখা দিল। কেউ বা তাঁকে গ্রীক জাতির নেতারূপে গ্রহণ করতে চাইলো, কেউ বা তাঁকে গ্রীক জাতির-স্বাধীনতা হরণকারী শত্রু ব'লে বর্ণনা করলো। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ী হয়ে ফিলিপ সমগ্র গ্রীসে তাঁর আধিপত্য স্থাপন করলেন। তিনি এশিয়া মাইনরে অবস্থিত গ্রীক রাজ্যগুলিকে পারস্যের অধীনতা থেকে মুক্ত করাও সংকল্প করলেন। কিন্তু এই সংকল্প সফল হওয়ার আগেই তিনি প্রাসাদে একটি ষড়যন্ত্রের ফলে নিহত হলেন।

আলেকজাণ্ডার ঃ ফিলিপের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **আলেকজাণ্ডার** রাজা হলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বিশ বছর। বাল্যকাল থেকেই ফিলিপ পুত্র আলেকজাণ্ডারকে তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য সুশিক্ষিত ক'রে তুলছিলেন। তিনি গ্রীসের সুবিখ্যাত দার্শনিক **অ্যারিস্টটলকে** বাল্যকাল থেকে আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। ফলে আলেকজাণ্ডার গ্রীক দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা সম্পর্কে উৎসাহী হয়েছিলেন। তিনি যুদ্ধবিদ্যাতেও অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন। এই বীর, বুদ্ধিমান্ এবং সুপুরুষ রাজকুমারের জন্য দেশবাসী ও সৈন্য-বাহিনী প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিল।

আলেকজাণ্ডার রাজা হওয়ার পর অনেকেই মনে করেছিল এবার মাসিডন দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই রাজ্যের অনেক স্থলে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। আলেকজাণ্ডার রাজা হয়েই প্রথমে উত্তরের বিদ্রোহী উপজাতিগুলিকে দমন করেন। ঐ সময় গ্রীসেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। আলেকজাণ্ডার গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলির মনে ভীতি সঞ্চারের জন্য থিবিস নগর-রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে

ধ্বংস করেন। গ্রীসের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য তিনি থিবিসে কেবলমাত্র গ্রীক কবি পিণ্ডারের গৃহটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি সমগ্র গ্রীসের নেতারূপে স্বীকৃত হন।

এখন আলেকজাণ্ডার তাঁর পিতার সংকল্প অনুযায়ী এশিয়া মাইনরের পরাধীন গ্রীক রাজ্যগুলিকে মুক্ত করার জন্য অগ্রসর হন। তিনি ঝড়ের গতিতে পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি এশিয়া মাইনরের গ্রীক রাজ্যগুলিকে মুক্ত ক'রে সিরিয়ায় এসে পৌঁছোন। এখানে পারস্য-সম্রাট তৃতীয় দরায়ুসের সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তৃতীয় দরায়ুস পলায়ন করেন এবং তিনি ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিমে অবস্থিত সমস্ত ভূখণ্ড ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করতে চান। কিন্তু আলেকজাণ্ডার তাতে সম্মত হন না। ঐ সময়ে মিশর পারস্য-সাম্রাজ্যের অধীন ছিল।

আলেকজাণ্ডার

আলেকজাণ্ডার মিশর অধিকার করেন। তিনি মিশরে আলেকজাণ্ড্রিয়া নামে একটি নগর স্থাপন করেন। এই আলেকজাণ্ড্রিয়া পরে গ্রীক সভ্যতা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে।

মিশর জয় ক'রে তিনি মেসোপটেমিয়ার মধ্য দিয়ে পারস্যের দিকে অগ্রসর হন। পারস্য সম্রাট তৃতীয় দরায়ুস যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। এই-ভাবে সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য আলেকজাণ্ডারের পদানত হয়। পারস্য সাম্রাজ্য উত্তরে মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আলেকজাণ্ডারের বাহিনী উত্তরে আফগানিস্থান পার হয়ে সমরখন্দ পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

অতঃপর আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে পূর্বদিকে ভারত অভিযান করেন। ঐ সময়ে সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। ঐসব রাজ্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে আলেকজাণ্ডারকে বাধা দিলো না। অনেক রাজ্য বিনা যুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করলো। কিন্তু ঝিলাম নদীর পূর্ব তীরে পুরুরাজ্য নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। পুরুরাজ আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করলেন না। তিনি ঝিলাম নদীর পূর্বতীরে সৈন্য সমাবেশ করলেন। রাতের অন্ধকারে

আলেকজাণ্ডার ঝিলাম নদী অতিক্রম ক'রে পুরুর সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করলেন। দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হ'লো। শেষ পর্যন্ত পুরু পরাজিত ও বন্দী হলেন। আলেকজাণ্ডার বন্দী পুরুরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি

আলেকজাণ্ডারের দিগ্‌বিজয়
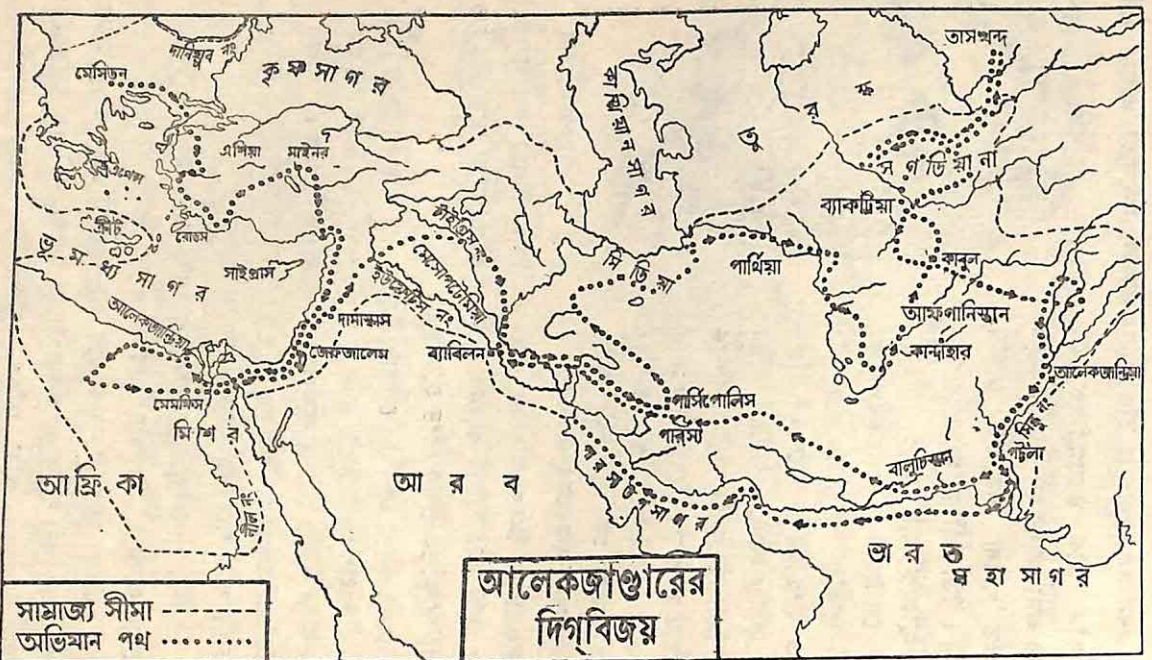
কিরূপ ব্যবহার আশা করেন?" পুরুরাজ নির্ভীকভাবে উত্তর দিলেন, "রাজার প্রতি রাজার ব্যবহার।" আলেকজাণ্ডার পুরুর সাহস, বীরত্ব ও

দেশপ্রেম দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তাঁকে মুক্তি দিলেন এবং গ্রীক-বিজিত ভারতীয় রাজ্যসমূহের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন।

আলেকজাণ্ডার ভারতের ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে তাঁর সৈন্যদল তাতে সম্মত হ'লো না। ঐ সময়ে মগধে নন্দবংশীয় রাজারা রাজত্ব করছিলেন। তাঁদের সাম্রাজ্য পাঞ্জাবের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁদের বিপুল সৈন্যবাহিনীর কথা গ্রীক সৈন্যরা শুনেছিল। তাছাড়া, গ্রীক সৈন্যরা প্রায় দশ বছর দেশ ত্যাগ ক'রে এসেছিল। দেশে ফেরার জন্য তারা উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। তাই আলেকজাণ্ডার ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ না ক'রে দেশে ফিরে চললেন। তিনি বেবিলন শহরে পেঁছিলেন। সেখানে হঠাৎ তিনি জ্বরে আক্রান্ত হলেন। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হ'লো।

৮. গ্রীক সাম্রাজ্যের পতন—রোমান আক্রমণ

আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের যোগ্য উত্তরাধিকারী না থাকায় তাঁর সেনাপতিরা এই বিশাল সাম্রাজ্য অধিকারের জন্য কলহে লিপ্ত হলেন। তাঁর প্রধান প্রধান সেনাপতি ছিলেন **সেলুকাস, এন্টিগোনাস** ও **টোলেমি**। সুদীর্ঘকাল তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ চলার পর আলেকজাণ্ডার-বিজিত সাম্রাজ্যের এশীয় অংশের অধিকারী হলেন সেলুকাস, মিশরের অধিকারী হলেন টোলেমি এবং গ্রীস ও মাসিডনের অধিকারী হলেন এণ্টিগোনাস। সেলুকাসের বংশধরগণ সিরিয়ার এন্টিওক থেকে তাঁদের এশীয় সাম্রাজ্য শাসন করতে থাকেন। টোলেমি মিশরে নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর বংশধররা ফারাওরূপে মিশর শাসন করতে থাকেন। এণ্টিগোনাসের বংশধরগণ মাসিডনে এবং গ্রীসে রাজত্ব করতে থাকেন। সাম্রাজ্যের এই তিন অংশের মধ্যে যুদ্ধ কলহ লেগেই থাকে। এই সময়ে গ্রীসের পশ্চিমে রোমানরা পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তারা পূর্ব দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হ'লে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকেই প্রথমে মাসিডন ও গ্রীস, তারপরে গ্রীক সাম্রাজ্যের এশীয় অংশ এবং শেষে মিশর রোমানদের পদানত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৩১ অব্দে মিশরে টোলেমি রাজবংশের শেষ রানী ক্লিওপেট্রা আত্মহত্যা করলে আলেকজাণ্ডার-প্রতিষ্ঠিত গ্রীক সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নও বিলুপ্ত হয়।

অনুশীলনী

১। ক্রীট কোথায় অবস্থিত? এর রাজধানীর নাম কি? এখানকার প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে কি জান?

২। গ্রীসের সঙ্গে ট্রয়ের যুদ্ধ কেন হয়েছিল ? এই যুদ্ধে কিভাবে কে জয়লাভ করেছিল ?

৩। হোমার কে ছিলেন ? তাঁর লেখা মহাকাব্য দুটির নাম কি ? হোমারীয় যুগ বলতে কি বোঝ ?

৪। হোমারীয় যুগের গ্রীস সম্বধে যা জান লিখ। গ্রীক দেবদেবীদের সম্বন্ধে কি জান ?

৫। গ্রীসে নগর-রাষ্ট্রগুলির উদ্ভব হয়েছিল কেন ? এইসব নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ ছিল ?

৬। গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলির শাসন-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল ?

৭। গ্রীকরা গ্রীসের বাইরে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল কেন ? ঐসব উপনিবেশের সঙ্গে গ্রীক রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক কিরূপ ছিল ?

৮। আথেন্সের সামাজিক, রাজনৈতিক জীবন কিরূপ ছিল ?

৯। স্পার্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন কিরূপ ছিল ?

১০। পারস্যের সঙ্গে গ্রীসের যুদ্ধের বিবরণ দাও।

১১। আথেন্সের অভ্যুত্থান ও পতন সম্পর্কে কি জান ?

১২। টীকা লিখ ঃ গ্রীস ও ট্রয়ের যুদ্ধ ; ম্যারাথনের যুদ্ধ ; থার্মোপাইলির যুদ্ধ ; পেরিক্লিস ; সক্রেতিস ; হেরোডটাস ; ফিডিয়াস ; ইকটিনাস ; রাজা ফিলিপ।

১৩। আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয় সম্পর্কে যা জান লিখ।

১৪। আলেকজাণ্ডারের পুরুরাজ্য বিজয়ের বিবরণ দাও।

১৫। রোমান আক্রমণ ও গ্রীক সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে যা জান লিখ।

১৬। শূন্য স্থান পূরণ কর ঃ

হোমার রচিত মহা কাব্য দুটির নাম — ও —। ট্রয় যুদ্ধের সময়ে মাইসেনির রাজা ছিলেন —। ক্রীটের রাজধানী ছিল —। হেরোডটাসকে — — বলা হয়। আলেকজাণ্ডারের হস্তে পরাজিত হন পারস্যসম্রাট — —। মিশরের রাণী — আত্মহত্যা করলে গ্রীক সাম্রাজ্যের শেষচিহ্নও বিলুপ্ত হয়।আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক ছিলেন —।

১৭। ভুল অংশ কেটে দাও ঃ

(ক) গ্রীক দেবরাজের নাম জিহোভা / জোভ / জিউস।

(খ) ট্রয়ের যুদ্ধ নিয়ে লেখা হোমারের মহাকাব্যের নাম ওডিসি / ইলিয়াড / আবেস্তা।

(গ) আথেন্সের সুবিখ্যাত টাইরেণ্টের নাম লিওনিডাস / আগামেম্নন / পেরিক্লিস।

অতিরিক্ত প্রশ্ন ঃ

১। গ্রীস উপদ্বীপের দক্ষিণাংশের নাম কি?

২। ঈজিয়ান সমুদ্র কোন্ দুইটি নগরের মাঝখানে অবস্থিত?

৩। মেনেলাস কে ছিলেন?

৪। হোমার কে ছিলেন? তিনি কি রচনা করেন? তার/তাদের নাম কি?

৫। গ্রীক দেবতাদের রাজার নাম কি?

৬। গ্রীস দেশের দুইটি প্রধান নগর রাষ্ট্রের নাম লিখ।

৭। টাইরেণ্ট বলতে কি বোঝ?

৮। তিনজন গ্রীক নাট্যকারের নাম লিখ।

৯। ইতিহাসের জনক কাহাকে বলা হয়?

১০। দুইজন গ্রীক দার্শনিকের নাম লিখ।

১১। ফিলিপের পুত্রের নাম কি?

১২। ঝিলম্ নদীর পূর্ব তীরের নদীর নাম কি?

১৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) গ্রীস উপদ্বীপের দক্ষিণাংশের নাম —।

খ) — ছিলেন স্পার্টার রাজা।

গ) — ছিল সংগীত ও — র দেবতা।

ঘ) গ্রীকরা দেবতার উদ্দেশ্যে — ও — বলি দিত।

ঙ) — নামে একজন সেনাপতি আথেন্সের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন।

১৪। সঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন দাও ঃ

ক) স্পার্টার রাজা লিওনিডাস পারসিক বাহিনীকে বাধা দেন—ঝিলম নদীর তীরে, থার্মোপাইলির গিরিপথে, খাইবার গিরিপথে।

খ) আথেন্সবাসীরা স্পার্টার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চালায় তার নাম—আথেন্স ও স্পার্টার যুদ্ধ, গ্রীক আথেন্স যুদ্ধ, পেলোপনেসীয় যুদ্ধ।

গ) ইতিহাসের জনক বলা হয়—হেরোডটাসকে, সফোক্লিসকে, আলেকজাণ্ডারকে।

ঘ) আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক ছিলেন দার্শনিক—প্লেটো, জিউস এ্যারিসটটল্।

ঙ) আলেকজাণ্ডার মিশরে একটি নগর স্থাপন করেন, যার নাম—ম্যাসিডন, আলেকজান্দ্রিয়া পারস্য।

চ) টোলেমি রাজবংশের শেষ রানীর নাম—হেলেন, এ্যাপলো, ক্লিওপেট্রা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রোম

১ রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা

গ্রীসদেশের পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরে আর একটি উপদ্বীপ আছে, তার নাম **ইটালি**। ইটালির উত্তরদিকে **আল্‌প্‌স্‌** পর্বতমালা দিয়ে এবং বাকী তিন দিকের অধিকাংশ সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। ইটালির ভূমি বেশ উর্বর হওয়ায় সুপ্রাচীনকাল থেকেই এখানে মানুষ এসে বসতি স্থাপন করেছিল। আর্য জাতির লোকেরা যখন ক্রমাগত দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে বসতি স্থাপন করছিল, তখন তাদের কয়েকটি উপজাতিও এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। এই উপজাতিগুলির মধ্যে **লাটিন** উপজাতিই প্রধান। লাটিন উপজাতির লোকেরা মধ্য-ইটালির **টাইবার** নদীর দক্ষিণে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

টাইবার নদীর উত্তরে অন্য এক জাতির লোক বাস করতো। তাদের নাম **এট্রাস্‌কান**। গ্রীসের দক্ষিণে ক্রীটদ্বীপে যে জাতির লোকেরা সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিল, এরা ছিল সম্ভবত, সেই জাতির লোক। আর ইটালির একেবারে দক্ষিণে ও সিসিলি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল গ্রীক জাতির লোকেরা।

মধ্য-ইটালিতে টাইবার নদীর মোহানার কাছে একটা জায়গায় সহজে নদী পার হওয়া যেত। ঐ জায়গাটার কাছেই টাইবার নদীর দক্ষিণ তীরে সাতটি পাহাড় ছিল। তাই পাহাড়ে ঘেরা নদীতীরের এই স্থানটির নানা সুবিধা ছিল। টাইবার নদীর উত্তর তীরে এট্রাস্‌কান জাতির লোকেরা বাস করতো। তারা সভ্য হ'লেও দুর্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর ছিল। তাদের আক্রমণ ঠেকাতেও এই স্থানটি উপযুক্ত ছিল। তাই এখানে লাটিন উপজাতির লোকেরা একটি শহর গ'ড়ে তুলেছিল। এই শহরের নাম **রোম**। খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫৩ অব্দে রোমের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলা হয়।

এই শহরের নাম কেন রোম হয়েছিল, তা নিয়ে একটি অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রাচীনকালে এক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম **নামিটর**। নামিটরের ছেলে ছিল না, ছিল এক মেয়ে। ঐ মেয়ের দুই ছেলে—**রেমাস** ও **রোমুলাস**। নামিটরের ভাই **এমুলিয়াস** সিংহাসন-লোভে শিশু রেমাস ও রোমুলাসকে গভীর বনে ফেলে দিয়ে আসে। এক নেকড়ে-বাঘিনীর দুধ খেয়ে শিশুরা বেঁচে থাকে। পরে তারা দুধর্ষ বীর হয়। তাদের মাতামহকে

সিংহাসনচ্যুত ক'রে এমুলিয়াস রাজা হয়েছিল। রেমাস ও রোমুলাস এমুলিয়াসকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে তাদের মাতামহকে সিংহাসনে বসায়। রোমুলাস একটি নগর স্থাপন করে। এই রোমুলাসের নাম অনুসারে এই নগরের নাম হয় রোম।

২. রোমানদের প্রথম দিকের সমাজ-ব্যবস্থা— প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান

গোড়ার দিকের রোমান অর্থাৎ লাটিন উপজাতিগুলির জীবনযাত্রা ছিল অতি সাধারণ। খ্রীষ্টের জন্মের সাড়ে চারশ বছর আগেও রোমের কাছে প্রায় ৪০০ বর্গ মাইল স্থান জুড়ে তারা গ্রামে বাস করতো। অধিকাংশ পরিবারের কিছু জমিজমা এবং একটি ক'রে সামান্য বসতবাড়ি ছিল। তাদের পোশাক ও হাতিয়ার অতিসাধারণ ছিল। সেগুলি তারা নিজেরাই তৈরী ক'রে নিতো। তাদের অন্যান্য জিনিস তারা শহরে গিয়ে সংগ্রহ করতো। রোমান-অধ্যুষিত অঞ্চলে বারোটি ছোট শহর ছিল। এখানে দেবদেবীর মন্দির, কারিগরদের কারখানা এবং ধনী ব্যক্তিদের বাসভবন ছিল। গ্রামবাসীরা উৎসব ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য শহরে আসতো। শহরগুলির মধ্যে প্রধান ছিল রোম।

গ্রীক ও অন্যান্য বহু আর্য জাতির মতোই তারা দেবদেবীর উপাসনা করতো। গ্রীকদের যেমন প্রধান দেবতা ছিলেন জিউস, রোমানদের তেমনি প্রধান দেবতা ছিলেন জুপিটর। রোমানদের যুদ্ধের দেবতা ছিলেন মার্স, বাণিজ্যের দেবতা ছিলেন মারকারি, প্রেমের দেবী ছিলেন ভেনাস, বিদ্যার দেবী ছিলেন মিনার্ভা।

সমাজে এক শ্রেণীর লোকে ক্রমেই অধিক সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠে। পরে দেশে মুদ্রা প্রচলিত হ'লে বুদ্ধিমান লোকেরা সুকৌশলে অর্থবান হতে থাকে। এইভাবে রোমান সমাজে একটি অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

রোম শহরকে কেন্দ্র ক'রে একটি রাজ্য গ'ড়ে ওঠে। কথিত আছে, এখানে প্রায় দেড়শ বছরে সাতজন রাজা রাজত্ব করেন। এই সাতজন রাজার শেষ তিনজন ছিল এট্রাসকান জাতির লোক। এরা টারকুইন নামে পরিচিত। এরা অত্যন্ত অত্যাচারী ও নৃশংস ছিল। রোম রাজ্যের প্রজারা শেষ টারকুইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাকে বিতাড়িত ক'রে দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

রোমান প্রজাতন্ত্রে যে নতুন শাসনব্যবস্থা চালু হয়, তাতে দুজন ক'রে কনসাল থাকেন। এঁদের হাতেই ছিল শাসন ও সামরিক বিভাগের সর্বোচ্চ

ক্ষমতা। এঁরা এক বৎসরের জন্য নির্বাচিত হতেন। দেশের সংকটকালে ছ'মাসের জন্য একজন ডিক্টেটর বা একনায়ক নিযুক্ত হতেন। শাসন ও বিচারের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটদেরও নির্বাচিত করা হ'তো। দেশ শাসনে অভিজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সেনেট বা উচ্চ পরিষদ থাকতো। সাধারণতঃ সেনেটের অধিকাংশই হতেন প্রাক্তন ও প্রবীণ ম্যাজিস্ট্রেটরা।

নাগরিকরা মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—অভিজাত ও সাধারণ নাগরিক। রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'লেও শাসনব্যবস্থায় সাধারণ নাগরিকদের কোন অংশ ছিল না। দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতেন দেশের অভিজাতরা। এঁদের বলা হ'তো প্যাট্রিসিয়ান। আর দেশের সাধারণ নাগরিকদের বলা হ'তো প্লেবিয়ান। প্যাট্রিসিয়ানরা ছিলেন বিরাট বিরাট জমিদারির মালিক এবং ধনী ব্যক্তি। তাঁরা প্লেবিয়ানদের নানাভাবে শোষণ করতেন এবং নিজেদের স্বার্থে দেশ শাসন করতেন। তাঁরা প্লেবিয়ানদের ঘৃণা করতেন। এমন কি, প্যাট্রিসিয়ানদের ও প্লেবিয়ানদের মধ্যে বিবাহও নিষিদ্ধ ছিল। এইসব কারণে প্লেবিয়ানদের অসন্তোষের সীমা ছিল না। প্লেবিয়ানরা এই অধিকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে এবং ধীরে ধীরে বহু অধিকার আদায় করে। তবে এজন্য তারা সশস্ত্র বিদ্রোহ করতো না। এখনকার ধর্মঘট বা অসহযোগের মতো প্রতিবাদের রীতি গ্রহণ করতো। তারা রোম ছেড়ে চ'লে গিয়ে অন্যত্র থাকত। তখন শাসকরা আপোস ক'রে তাদের ফিরিয়ে আনতেন।

এইসব সংগ্রামের ফলে প্লেবিয়ানদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিনিধিমণ্ডল বা ট্রিবিউন প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে লিখিত আইন প্রচলিত ছিল না। ফলে ম্যাজিস্ট্রেটরা প্রায়ই অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থে ইচ্ছা মতো আইন প্রয়োগ করতেন। প্লেবিয়ানদের চাপে আইনসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয় এবং প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের মধ্যে বিবাহ আর নিষিদ্ধ থাকে না। প্লেবিয়ান শ্রেণীর লোকও যোগ্য হ'লে কনসাল পদে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার পায়। জমিদারদের জমির ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়।

৩. রোমের অধিকার বিস্তার—রোমান নাগরিক

প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের মধ্যে যখন ক্ষমতার লড়াই চলছিল, তখন লাটিন উপজাতিগুলি নিজেদের অধিকার ও প্রভুত্ব বিস্তারেও ব্যস্ত ছিল। রোম থেকে এট্রাস্কান রাজাকে তাড়ানো হ'লেও টাইবার নদীর উত্তর দিকে এট্রাস্কানদের অধিকার তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। রোমের কয়েক মাইল উত্তরে এট্রাস্কানদের সুরক্ষিত একটি দুর্গ ছিল। অনেক যুদ্ধের পর রোমানরা শেষ পর্যন্ত এই দুর্গ অধিকার করে এবং এট্রাস্কান জাতিকে

পদানত করে। গল্ নামে আর্য জাতির অন্য একটি শাখা উত্তর থেকে রোম আক্রমণ করে। কিন্তু রোমের জুপিটারের মন্দিরের হাঁসের দল রাত্রিতে কলরব ক'রে ওঠায় রোমান সৈনিকরা জেগে ওঠে এবং গল্‌দের হাত থেকে রোম রক্ষা পায়। পরে রোমানরা গল্‌দের পরাজিত ক'রে ইটালি থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং ইটালির উত্তর প্রান্তে বহু সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ ক'রে গল্ আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করে। দক্ষিণে নেপল্‌স্ পর্যন্ত রোমানদের অধিকার বিস্তৃত হয়। এর দক্ষিণে ইটালির মূল ভূখন্ডে এবং সিসিলি দ্বীপে যে গ্রীক রাজ্যগুলি ছিল, সেগুলির অধিকার নিয়ে গ্রীকদের সঙ্গে রোমানদের যুদ্ধ বাধে। শেষ পর্যন্ত রোমানরা জয়ী হয়। এইভাবে সমগ্র উপদ্বীপে রোমানদের অধিকার বিস্তৃত হয়।

প্রথমে লাটিন উপজাতির লোকেরাই রোমের নাগরিক ব'লে পরিচিত ছিল। কিন্তু রোমের অধিকার যতোই বিস্তৃত হ'লো, ততোই অন্যান্য উপজাতির লোকেরাও রোমের নাগরিক ব'লে গণ্য হ'লো। সারা দেশে বড় বড় রাস্তা নির্মিত হ'লো। রাজ্যের সকল স্থানের রোমান নাগরিক ভোটাধিকার পেলো। পরে রোম সাম্রাজ্য যখন পশ্চিমে ইংলন্ড থেকে পূর্বে মেসোপটেমিয়া এবং দক্ষিণে মিশর, আলজিরিয়া, টিউনিস ও মরক্কো থেকে উত্তরে দক্ষিণ-রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, তখনও রোম-অধিকৃত সকল স্থানের স্বাধীন অধিবাসীরা রোমের নাগরিক ব'লে গণ্য হয়েছিল। নির্বাচনকালে রোমে উপস্থিত থাকলে তারা সকলেই ভোট দিতে পারতো।

৪. কার্থেজের সঙ্গে রোমের সংঘর্ষ

মিশর ও মেসোপটেমিয়া যখন সুসভ্য হয়ে উঠেছিল, তখন ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে ফিনিসীয় জাতির লোকেরাও সুসভ্য হয়ে উঠেছিল। তারা নৌচালনায় ও নৌবাণিজ্যে সুদক্ষ হওয়ায় ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে বহু উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এইভাবেই তারা ইটালির ঠিক দক্ষিণে ভূমধ্য-সাগরের দক্ষিণ উপকূলে আফ্রিকাতেও একটি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং কার্থেজ নামে একটি নগরী গ'ড়ে তুলেছিল। পারস্য সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের কালে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ফিনিসিয়ার পতন ঘটলে কার্থেজ ফিনিসীয়দের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কার্থেজকে কেন্দ্র ক'রে ফিনিসীয়রা উত্তর আফ্রিকায় ও দক্ষিণ স্পেনে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গ'ড়ে তোলে। রোমানরা সমস্ত ইটালিতে প্রভুত্ব স্থাপন করলে ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য নিয়ে রোমের সঙ্গে কার্থেজের বিরোধ বাধে। এই বিরোধের ফলে রোম ও কার্থেজের মধ্যে সুদীর্ঘকাল যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধ পিউনিক যুদ্ধ নামে পরিচিত। রোম ও কার্থেজের মধ্যে তিনবার যুদ্ধ হয়েছিল।

ইটালির মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণেই সিসিলি দ্বীপটি অবস্থিত। সিসিলিতে প্রভুত্ব নিয়ে কার্থেজের সঙ্গে রোমের **প্রথম পিউনিক যুদ্ধ** হয়েছিল (খ্রীঃ পূঃ ২৭০)। যুদ্ধে কার্থেজ পরাজিত হয় এবং সিসিলি রোমের অধিকারে যায়।

এরপর রোম কার্থেজ-অধিকৃত কর্সিকা ও **সার্ডিনিয়া** নামে দুটি দ্বীপও অধিকার করে নিলো। ইতিমধ্যে রোমের সাম্রাজ্য উত্তর স্পেনেও বিস্তৃত হয়েছিল। স্পেনের দক্ষিণ অংশ ছিল কার্থেজের অধিকারে। কার্থেজের বীর সেনাপতি **হানিবল** সমুদ্র-পথে রোমকে পরাজিত করা অসম্ভব জেনে স্পেনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে উত্তর দিক থেকে ইটালি আক্রমণের সংকল্প করলেন। হানিবল কার্থেজ ও রোম সাম্রাজ্যের সীমারেখা এব্রো নদী অতিক্রম করলে রোম ও কার্থেজের মধ্যে **দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ** বাধলো (খ্রীঃ পূঃ ২১৭)। হানিবল পর পর অনেকগুলি যুদ্ধে রোমান বাহিনীকে পরাজিত ক'রে অগ্রসর হলেন এবং আল্‌প্‌স্‌ পর্বতমালা অতিক্রম ক'রে ইটালিতে প্রবেশ করলেন। দীর্ঘ ষোল বছর ধ'রে যুদ্ধ চললো। রোমানরা শেষ পর্যন্ত হানিবলের অগ্রগতি রোধ করলো। রোমানরা উত্তরে হানিবলের গতিরোধ ক'রে তারা দক্ষিণে সমুদ্রপথে কার্থেজ আক্রমণ করলো। কার্থেজ বিপন্ন হওয়ায় **হানিবল** কার্থেজে ফিরতে বাধ্য হলেন। সেখানে জামীর যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলেন। কার্থেজ রোমের বশ্যতা স্বীকার করলো এবং সেনাপতি হানিবলকে রোমের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলো। হানিবল গোপনে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু আত্মগোপন ক'রে থাকা অসম্ভব বুঝে আত্মহত্যা করলেন। রোমানরা স্পেন ও কার্থেজের নৌবহর অধিকার ক'রে নিলো।

এরপর প্রায় পঞ্চাশ বছর কার্থেজ দীন-হীন অবস্থায় কাটালো। রোম সাম্রাজ্য আরো শক্তিশালী হয়ে উঠলো। কার্থেজ আবার নিজেকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুলতে সচেষ্ট হ'লে রোমের তা সহ্য হ'লো না। সামান্য ছুতায় রোম কার্থেজ আক্রমণ করলো এবং কার্থেজ শহরকে ধ্বংস ক'রে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিলো (খ্রীঃ পূঃ ১৪৬)। এইভাবে তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ শেষ হ'লো। মিশর ছাড়া সমস্ত উত্তর আফ্রিকা রোমের অধিকারে গেল।

৫. ক্রীতদাস প্রথা ও ক্রীতদাস-বিদ্রোহ

ক্রীতদাস-প্রথা বহু প্রাচীনকাল থেকেই দেশে দেশে প্রচলিত ছিল। যুদ্ধে পরাজিত বন্দীদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হ'তো। তাদের দিয়ে য'তো ঘৃণ্য

ও মেহনতী কাজ করানো হ'তো। হাটে-বাজারে তাদের বিক্রি করা হ'তো।

রোমান ক্রীতদাস

তাদের মানুষ ব'লেই গণ্য করা হ'তো না। তাদের উপর প্রায়ই অকথ্য অত্যাচার চালানো হ'তো।

রোমানরা যতোই সাম্রাজ্য বিস্তার করছিল, ততোই বিশাল সৈন্যবাহিনী গ'ড়ে তোলার জন্য রোমের স্বাধীন নাগরিকদের ডাক পড়ছিল। রোমান নাগরিকরা সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ায় দেশের কৃষিকার্যে, শ্রমশিল্পে এবং অন্যান্য মেহনতী কাজে ক্রীতদাসদের নিযুক্ত করা হচ্ছিল। রোমানরা দেশের পর দেশ জয় ক'রে পরাজিত বন্দীদের পরিণত করছিল ক্রীতদাসে। তাই ক্রীতদাসেরও অভাব ছিল না।

রোমানরা ক্রমাগত যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় হত্যাকাণ্ড তাদের কাছে আমোদ-প্রমোদে পরিণত হয়েছিল। তারা ক্রীতদাসদের নিজেদের মধ্যে লড়াই ক'রে পরস্পরকে হত্যা করতে বাধ্য করতো এবং ঐরকম হত্যাকাণ্ড দেখে আনন্দ পেতো। এইসব ক্রীতদাসদের লড়াই শেখানো হ'তো। এদের বলা হ'তো গ্ল্যাডিয়েটর। গ্ল্যাডিয়েটরের লড়াই একটি অত্যন্ত আমোদজনক প্রদর্শনীতে পরিণত হয়। এই ধরণের লড়াই দেখানোর জন্য বড় বড় স্টেডিয়াম তৈরী হয়, যার নাম অ্যাম্ফি-থিয়েটার ও কলোসিয়াম। অ্যাম্ফিথিয়েটারে বা কলোসিয়ামে বসে হাজার হাজার দর্শক গ্ল্যাডিয়েটরদের ভয়ংকর লড়াই দেখতো।

ক্রীতদাসদের জীবন অত্যন্ত দুঃসহ ছিল। তার ওপর ক্রীতদাসদের এই হিংস্র লড়াই ক্রীতদাস-প্রথাকে আরো ভয়ংকর ক'রে তুলেছিল। শুধু নিজের মৃত্যু নয়, অকারণে অন্যকে হিংস্রভাবে হত্যা করার বিরুদ্ধে গ্ল্যাডিয়েটরদের বিক্ষোভের সীমা ছিল না। সারা দেশে ক্রীতদাসরাও অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ছিল। গ্ল্যাডিয়েটদের নেতৃত্বে সারা দেশে ক্রীতদাসরা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। এই দেশব্যাপী দাস-বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন দুর্ধর্ষ গ্ল্যাডিয়েটর স্পার্টাকাস। স্পার্টাকাস সত্তর জন গ্ল্যাডিয়েটরের সঙ্গে এই বিদ্রোহের সূচনা করেন। দিকে দিকে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। সর্বত্র ক্রীতদাসরা রোমান নাগরিকদের উপর

আক্রমণ চালায় এবং হত্যা, অগ্নিকাণ্ড ও ধ্বংস চালাতে থাকে। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সারা দেশে রোমান বাহিনী নিযুক্ত হয়। স্পার্টাকাস তাঁর
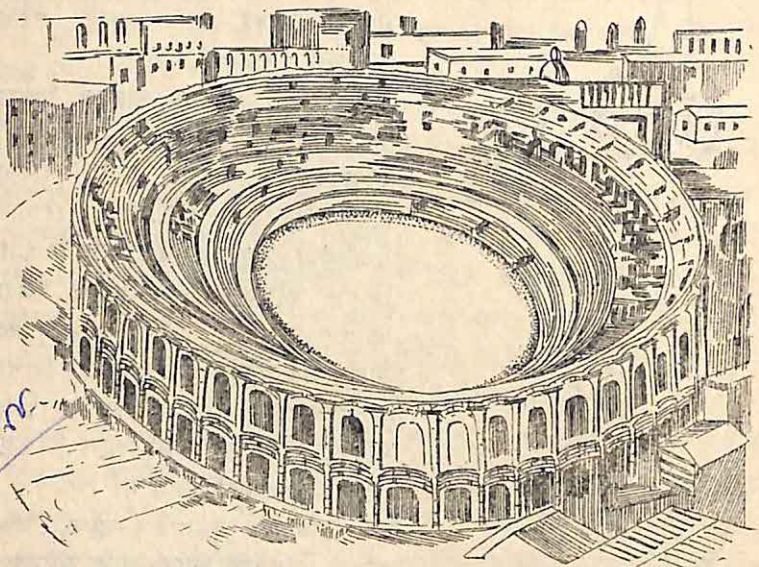
রোমের কলোসিয়াম

দলবল নিয়ে ভিসুবিয়াস আগ্নেয়গিরির সুপ্ত জ্বালামুখীতে আশ্রয় নেন। শেষ পর্যন্ত রোমান সেনাপতি ক্র্যাসাস এই বিদ্রোহ দমন করেন ছ'
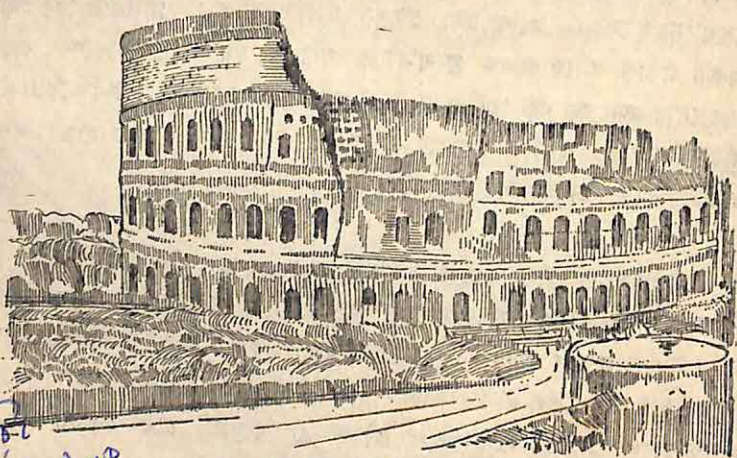
অ্যাম্ফি-থিয়েটার

হাজার বিদ্রোহী ক্রীতদাস সহ স্পার্টাকাস বন্দী হন। ক্রীতদাসদের মধ্যে

আতঙ্ক সঞ্চারের জন্য বন্দী ক্রীতদাসদের রোম থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত বিখ্যাত রাজপথ অ্যাপিয়ান ওয়েতে ক্রুশবিদ্ধ ক'রে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

৬. জুলিয়াস সীজার—রোমান প্রজাতন্ত্রের অবসান—নব রোম সাম্রাজ্য

রোম এখন ক্রমাগত দেশের পর দেশ জয় করতে থাকায় রোমের সৈন্য-বাহিনী সুবিশাল হয়ে উঠেছিল। দেশে সর্বাধিক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন জনপ্রিয় সেনাপতিরা। স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ দমন ক'রে সেনাপতি ক্র্যাসাস খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ঐ সময়ে আরো দুজন খুবই জনপ্রিয় সেনাপতি ছিলেন—পম্পি ও জুলিয়াস সীজার। এই তিনজনকে নিয়ে গঠিত হয় রোমের ট্রায়াম্ভিরেট বা ত্রয়ী শাসক। সাম্রাজ্যের কোন্ অংশে কে শাসন ও যুদ্ধ-পরিচালনা করবেন তাও নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয়।

রোম সাম্রাজ্যে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্য এদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা ছিল। ক্র্যাসাস পূর্বদিকে সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি পারস্য আক্রমণকালে নিহত হলেন। এখন রোমের সর্বময় ক্ষমতা নিয়ে পম্পির সঙ্গে জুলিয়াস সীজারের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল। জুলিয়াস সীজার রোম সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম দিকে তাঁর বিজয়-অভিযান চালাচ্ছিলেন। তিনি গল্‌দের দেশ—এখনকার ফ্রান্স ও বেলজিয়াম—জয় করেন এবং ইংলণ্ডে দু'বার অভিযান চালান। এখন ক্র্যাসাসের মৃত্যুর পর তিনি সাম্রাজ্য জয়ের অভিযান ফেলে সসৈন্যে ফিরে আসেন। পম্পি তাঁকে বাধা দেওয়ার জন্য পূর্বদিক থেকে অগ্রসর হলেন। সীজারের হাতে
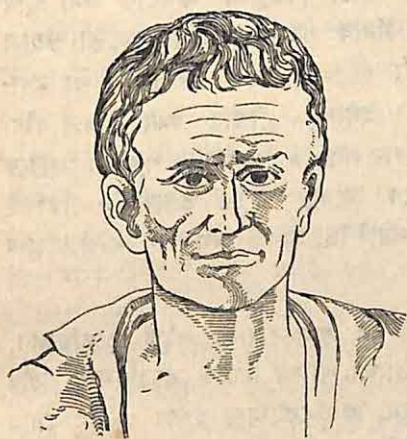
জুলিয়াস সীজার

পম্পি পরাজিত হয়ে মিশরে পালিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি নিহত হলেন এবং জুলিয়াস সীজার মিশর অধিকার করলেন। রোমে ফিরে জুলিয়াস সীজার রোম সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হ'লেন। তাঁকে সারা জীবনের জন্য

রোম সাম্রাজ্যের একনায়ক বা ডিক্টেটর নিযুক্ত করা হ'লো (খ্রীঃ পূঃ ৪৫)।

রোমানরা টারকুইন রাজাদের দুঃসহ অত্যাচারের কথা ভোলে নি। 'রাজা' শব্দটাই তাদের কাছে অত্যন্ত ঘৃণার বস্তু ছিল। তাই জুলিয়াস সীজারকে তাঁর ভক্তরা রাজমুকুট দিতে চাইলে তিনি তা নিলেন না ; কিন্তু রাজদণ্ড নিলেন এবং সিংহাসনেও বসলেন। তিনি মিশর জয় করেছিলেন। সেখানে ফারাওকে দেবতা মনে করা হ'তো। জুলিয়াস সীজার তারই অনুকরণে রোমে একটি মন্দির নির্মাণ ক'রে তাতে নিজের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

রোমের প্রজাতন্ত্রী ব্যক্তিরা এসব সহ্য করলেন না। তাঁরা ব্রুটাস নামে এক জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তির নেতৃত্বে ষড়যন্ত্র করলেন। এই ষড়যন্ত্র-কারীরা সকলেই জুলিয়াস সীজারের বন্ধু ছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা সেনেট ভবনে হঠাৎ জুলিয়াস সীজারকে আক্রমণ করলেন। তাঁর দেহের তেইশ জায়গায় ছুরিকাঘাত করা হ'লো। তাঁর মৃতদেহ পম্পির প্রস্তরমূর্তির পদতলে লুটিয়ে পড়লো (খ্রীঃ পূঃ ৪৪)।

জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুতে কিন্তু রোম সাম্রাজ্যে পুনরায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'লো না। জুলিয়াস সীজারের তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্র অক্টোভিয়াস সীজার এবং জুলিয়াস সীজারের অনুগত সেনাপতি মার্ক অ্যাণ্টনি প্রজাতন্ত্রীদের পরাজিত করলেন। আরো কিছুদিন ক্ষমতার জন্য যুদ্ধ চললো। শেষ পর্যন্ত মার্ক অ্যান্টনিকে পরাজিত ক'রে অক্টোভিয়াস সীজার রোম সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হলেন। তিনি অগাস্টাস বা মহা-মহিমান্বিত উপাধিতে ভূষিত হলেন। অগাস্টাস সীজার যেমন ছিলেন বীর, বুদ্ধিমান, তেমনি জনপ্রিয়। তিনি রোম সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন, সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ক'রে তুললেন। তিনিই প্রকৃতপক্ষে রোম সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট ছিলেন। অগাস্টাস সীজার প্রায় চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

অগাস্টাস সীজার রোম সাম্রাজ্যে যে শাসনব্যবস্থা গ'ড়ে তুলেছিলেন, তার ফলে রোম সাম্রাজ্যে প্রায় দু' শতাব্দী শান্তি বিরাজ করেছিল। তাঁর উত্তরাধিকারীর অনেকে অযোগ্য, এমন কি অর্ধোন্মাদ হওয়া সত্ত্বেও রোম সাম্রাজ্যের কোনো ক্ষতি হয়নি। তাঁর কয়েকজন উত্তরাধিকারী পর পর সিংহাসনে বসায় সম্রাট অর্থেই সীজার শব্দ ব্যবহৃত হ'তে লাগলো।

পরবর্তী সম্রাটদের মধ্যে অনেকেই খুবই দক্ষ শাসক ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। এঁদের মধ্যে ক্লডিয়াস, ট্রাজান, হাড্রিয়ান, মার্কাস অরে-

লিয়াস প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রোম সাম্রাজ্য পশ্চিমে ইংলণ্ড
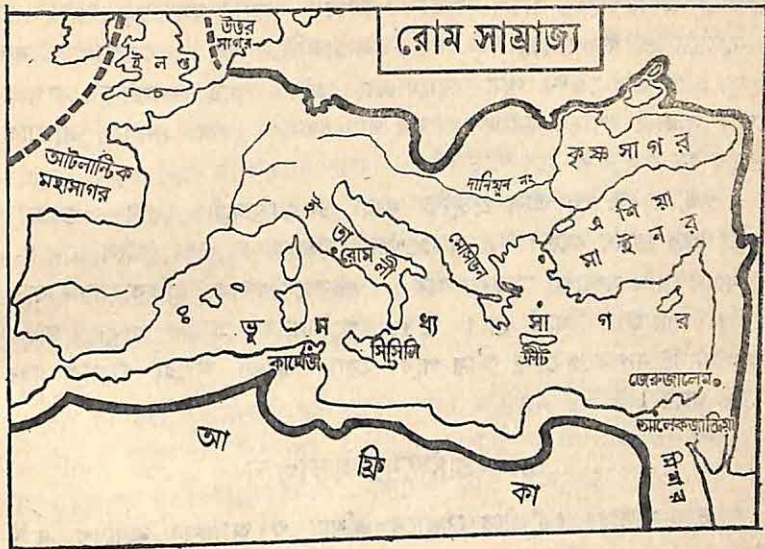
থেকে পূর্বে ইউফ্রেটিস নদী এবং উত্তরে রাইন ও দানিয়ুব নদী থেকে দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৭. রোম সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন

রোম সাম্রাজ্য প্রায় পাঁচ শ' বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। এই পাঁচ শ' বছরে রোম সাম্রাজ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। বাইরে ধনী ব্যক্তিদের বিলাস-ব্যসন ও ঐশ্বর্যের আড়ম্বর থাকলেও সাধারণ মানুষের জীবন দুঃখ-দারিদ্র্যে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। যে সামরিক শক্তির দ্বারা রোম সাম্রাজ্য একদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা এখন ছিল না। অন্য পক্ষে রোম সাম্রাজ্যের উত্তরে অন্যান্য আর্য উপজাতি এবং উত্তর-পূর্বে মঙ্গোল উপজাতি দুর্ধর্ষ হয়েছিল। এইসব আর্য উপজাতিগুলি ফ্রাঙ্ক, ভ্যান্ডাল, পশ্চিমী গথ ও পূর্বী গথ এবং মঙ্গোলরা হূণ নামে পরিচিত।

উত্তরের দুর্ধর্ষ আর্য উপজাতিগুলি রোম সাম্রাজ্যের দ্বারদেশে ক্রমাগত আঘাত হানতে থাকে। রোমানদের আগেকার সেই বলবীর্য এখন না থাকায় রোমান সম্রাটরা তাঁদের সৈন্যবাহিনীতে এইসব দুর্ধর্ষ উপজাতির লোকদের প্রায়ই সৈনিকরূপে নিয়োগ করতেন। অনেক দুর্ধর্ষ উপজাতিকে তাঁরা উত্তর ইটালিতে বসবাসের সুযোগও দিয়েছিলেন। এইসব উপজাতির সৈনিক, সেনাপতি ও প্রজারা প্রায়ই রোম সম্রাটকে সংকটে ফেলতো। তাই রোম

সম্রাট্ কনস্টান্টাইন সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশে কৃষ্ণসাগরের তীরে বাইজান্টিয়ামে একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। সম্রাট কনস্টান্টাইনের নাম অনুসারে এই রাজধানীর নাম হয় কনস্টান্টিনোপল। কনস্টান্টাইনের মৃত্যু হ'লে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রোমে এবং কনিষ্ঠ পুত্র কনস্টান্টিনোপলে থেকে সাম্রাজ্য শাসন করতে থাকেন। এইভাবে রোম সাম্রাজ্য দুভাগে বিভক্ত হয় ও দুর্বল হয়ে পড়ে।

গথ, ফ্রাংক, ভ্যান্ডাল প্রভৃতি আর্য উপজাতিগুলি রোম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তারা লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড এবং ধ্বংস চালায়। হূণরাও রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। এইভাবে ক্রমাগত বহিরাক্রমণের ফলে রোম সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমের পতন ঘটে। কনস্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র ক'রে পূর্বী রোম সাম্রাজ্য আরো হাজার বছর টিকে থাকে।

৮. খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুত্থান

ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে যেখানে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ দুটি মিশেছে, সেখানে জুডিয়া নামে একটি রাজ্য ছিল। জুডিয়ায় ইহুদীদের বাস। জুডিয়া রোম সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। সম্রাট অগাস্টাস সীজার যখন রোমের সম্রাট, তখন জুডিয়ায় জেরুজালেম শহরের কাছে বেথ্লেহেমে যিশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়। যিশু খ্রীষ্ট তিরিশ বছর বয়সে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মমত খ্রীষ্টধর্ম নামে পরিচিত।

যিশু সৎ ও সরল জীবনের আদর্শ এবং পৃথিবীতে আশু ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করতে থাকেন। তিনি বললেন, যারা সৎ, বিনয়ী, ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু, অপরের প্রতি স্নেহশীল, তারাই এই ঈশ্বরের রাজ্যে স্থান পাবে। ঈশ্বরই সকল জীবের স্রষ্টা, সকল মানুষই তাঁর সন্তান ; তাই মানুষ মাত্রেই ভাই-ভাই। তিনি সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের নিন্দা করলেন। তিনি বললেন, একটি উটের পক্ষে সূচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে গলা যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব ধনীদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা। তিনি বললেন, পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে ঘৃণা করো, না। কারণ, পাপীও ঈশ্বরের সন্তান, পাপীও তোমার ভাই। হিংসা ত্যাগ করো, শত্রুকেও ক্ষমা করো। কেউ তোমার এক গালে চড় মারলে তাকে তোমার অপর গালটি পেতে দাও। কেউ তোমার গামছাটি চুরি করলে তাকে তোমার কম্বলটি দাও। সবার আগে যে মজুরটি এসেছে এবং সবার শেষে যে মজুরটি এসেছে, দুজনকেই সমান মজুরি দাও। এইভাবে যিশু নগরে জনপদে ঘুরে ঘুরে অহিংসা, ক্ষমা, প্রেম ও সাম্যের বাণী প্রচার করতে লাগলেন।

তিনি তাঁর উপদেশগুলি গল্পের ছলে বলতেন। তাই সাধারণ মানুষ তা সহজেই বুঝতে পারতো। তাছাড়া, তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে তাঁর প্রতি মানুষ সহজেই আকৃষ্ট হ'তো।

যিশু ইহুদী জাতিতেই জন্মেছিলেন। ইহুদীদের ধর্মমতের সঙ্গে তাঁর ধর্মমতের মিল না হওয়ায় তারা তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তিনি ছিলেন তাদের চোখে ধর্মদ্রোহী। তিনি পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা বলায় তারা রোমান শাসকদের বোঝাতে চাইলো যে, তিনি একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা বলছেন। ধর্মদ্রোহ ও রাজদ্রোহের অপরাধে বিচারে যিশুর প্রাণদণ্ড হ'লো। তাঁকে দুই চোরের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ ক'রে হত্যা করা হ'লো।

যিশুকে হত্যা করলেও যিশুর বাণী ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। দলে দলে মানুষ খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী হ'লো। যিশুর বাণী প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা, যুদ্ধ, ধনী-দরিদ্রের অসাম্য, মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার ও অবিচারের বিরোধী ছিল। রোমানদের ধর্মেরও তা বিরোধী ছিল। তাই খৃষ্টধর্মীদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার চললো। তাদের ধরে জেলে পোরা হ'লো; হত্যা করা হ'লো, আগুনে পোড়ানো হ'লো, হিংস্র জন্তুর মুখে ফেলে খাইয়ে দেওয়া হ'লো। তবু খৃষ্টধর্মীদের তাদের বিশ্বাস থেকে টলানো গেল না। ক্রমেই খৃষ্টধর্মীর সংখ্যা বাড়তে লাগলো।

এইভাবে তিনশ বছরেরও বেশি অত্যাচার চলল। শেষে রোম সম্রাট **কন্‌স্টান্‌টাইন** নিজে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন এবং খৃষ্টধর্মকে রোম সাম্রাজ্যের সরকারী ধর্ম ব'লে স্বীকার করলেন। ইতিমধ্যে রোম সাম্রাজ্যের বাইরেও খৃষ্টধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। ক্রমে তা সারা ইউরোপে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার অনেক দেশেই ছড়িয়ে পড়লো।

অনুশীলনী

১। রোম কোথায় অবস্থিত? কবে রোম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলা হয়? কে রোম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলা হয়? তাঁর সম্পর্কে কি গল্প প্রচলিত আছে?

২। এট্রাস্কান জাতি সম্বন্ধে কি জান? রোমের এট্রাস্কান-জাতীয় রাজাদের কি বলা হ'ত? এট্রাস্কানদের সঙ্গে রোমানদের সম্পর্ক কিরূপ ছিল?

৩। কার্থেজ কোথায় ? এখানে কারা কিভাবে সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুলেছিল ? রোমের সঙ্গে কার্থেজের বিবাদ বেধেছিল কেন ? বিবাদের ফল কি হয়েছিল ?

৪। প্রথম পিউনিক যুদ্ধ সম্বন্ধে যা জান লিখ।

৫। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ সম্পর্কে যা জান লিখ।

৬। তৃতীয় পিকনিক যুদ্ধ সম্বন্ধে যা জান লিখ।

৭। গোড়ার দিকের রোমানদের সমাজ কেমন ছিল ?

৮। প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান কাদের বলা হ'ত ? এদের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ ছিল ; প্লেবিয়ানরা সংগ্রাম ক'রে কি কি অধিকার আদায় করেছিল ?

৯। রোমান নাগরিকত্ব সম্বন্ধে কি জান ?

১০। রোমে ক্রীতদাসদের অবস্থা কেমন ছিল ? গ্ল্যাডিয়েটর কাদের বলা হ'ত ?

১১। রোমে ক্রীতদাস বিদ্রোহের বিবরণ দাও।

১২। জুলিয়াস সীজার কিভাবে রোমের সর্বময় কর্তৃত্ব অধিকার করেছিলেন ? প্রজাতন্ত্রীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল কেন ? এই ষড়যন্ত্রের ফল কি হয়েছিল ?

১৩। কিভাবে রোমে প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটেছিল লিখ।

১৪। কিভাবে রোম সম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল ?

১৫। যিশু খ্রীষ্টের জীবন ও খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুত্থান সম্পর্কে যা জান লিখ।

১৬। টীকা লিখঃ হানিবল ; পম্প ; জুলিয়াস সীজার ; অক্টোভিয়াস সীজার ; স্পার্টাকাস ; কনস্টান্‌টাইন।

১৭। ঠিক উক্তিগুলির নীচে দাগ দাওঃ

(ক) রোম নগর টাইবার নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত ছিল। (খ) রোমের এট্রাস্‌কান রাজাদের বলা হ'ত 'টারকুইন'। (গ) স্পার্টাকাস ছিলেন বিখ্যাত গ্ল্যাডিয়েটর। (খ) জুলিয়াস সীজার রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়েছিলেন। (ঙ) যিশু খ্রীষ্ট অগাস্টাস সীজারের শাসনকালে জন্মগ্রহণ করেন। (চ) রোমে প্লেবিয়ানরাই শাসনকার্য চালাতেন। (ছ) সম্রাট কনস্টান্‌টাইন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

১। রোম নগরীর নামকরণ হয় কার নামানুসারে ?
২। রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা হয় কবে ?
৩। রোমানদের প্রধান দেবতার নাম কি ?
৪। রোমান নাগরিকরা কয়শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ?
৫। রোমদেশের শাসনব্যবস্থা কারা পরিচালনা করতেন ?
৬। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে কোন জাতির লোকেরা সভ্য হয়ে ওঠে ?
৭। রোম ও কার্থেজের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ যে যুদ্ধ হয়, তার নাম কি ?
৮। কার্থেজের বীর সেনাপতির নাম কি ?
৯। রোম ও কার্থেজদের মধ্যে মোট কয়টি যুদ্ধ হয় ? কি কি ?
১০। কলোসিয়াম বলতে কি বোঝ ?
১১। দাস বিদ্রোহের নেতার নাম কি ?
১২। দাস বিদ্রোহ কে দমন করেন ?
১৩। কোন্ তিনজনকে নিয়ে রোমের ট্রায়াম্‌ভিরেট বা "ত্রয়ী শাসক" গঠিত হয় ?
১৪। জুলিয়াস সীজারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন কে ?
১৫। যিশুখ্রীষ্ট কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?
১৬। "পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে ঘৃণা ক'র না"—কথাটি কার ?
১৭। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
 ক. রোমানদের বিদ্যার দেবী ছিলেন — ।
 খ. রোমের অভিজাত নাগরিকদের বলা হত — ।
 গ. প্লেবিয়ানদের স্বার্থরক্ষার জন্য — প্রতিষ্ঠিত হয় ।
 ঘ. — — ফিনিশিয়দের প্রধান কেন্দ্র ।
১৮। সঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন দাও ঃ
 ক. রোমদেশের সাধারণ নাগরিকদের বলা হত — কলোসিয়াম, ভেনাস, প্লেবিয়ান ।
 খ. যে সব ক্রীতদাসদের লড়াই শেখান হত, তাদের বলা হত — সেনাপতি, গ্ল্যাডিয়েটর, কন্‌সাল ।
 গ ক্রীতদাসদের লড়াই দেখানোর জন্যে যে বড় বড় স্টেডিয়াম তৈরী হত, তার নাম — থিয়েটার হল, কলোসিয়াম, ম্যারাথন ।
 ঘ. রোমের পতন ঘটে — ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, খ্রীঃ পূঃ ৪৮৭ অব্দে, ৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে ।
 ঙ. ধর্মদ্রোহ ও রাজদ্রোহের অপরাধে প্রাণদণ্ড হয় — সলোমনের, মুশার, যিশুর ।

নবম পরিচ্ছেদ

চীনদেশ

১. চীনে শ্যাং ও চৌ বংশীয়দের শাসন—রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা—কনফুসিয়াস

চীনের প্রাচীন ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায়, সুপ্রাচীন কালে চীনদেশে পাঁচজন বিখ্যাত সম্রাট রাজত্ব করেছিলেন এবং তাঁদের পরে চীনদেশে পর পর কয়েকটি রাজবংশ রাজত্ব করে। তবে এইসব রাজবংশ সারা চীনে আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিল, মনে হয় না। খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৫০ থেকে ১১২৫ অব্দ পর্যন্ত শ্যাং রাজবংশ সারা চীনে রাজত্ব করেছিলেন বলা হয়। শ্যাং বংশের শেষ রাজা অত্যন্ত নির্বোধ ও নিষ্ঠুর ছিলেন। তিনি চৌ-বংশীয় আউ ওয়াংয়ের হস্তে পরাজিত হয়ে আত্মহত্যা করেন। ফলে চীনে চৌ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

শ্যাং ও চৌ বংশীয় রাজারা সারা চীনে আধিপত্য বিস্তার করলেও তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সম্রাট ছিলেন না। তাঁরা সারা দেশের ধর্মীয় ব্যাপারেই প্রধান ছিলেন—অর্থাৎ সারা দেশের হয়ে দেবতার কাছে পূজা, বলি প্রভৃতি দিতেন। দেশের প্রকৃত শাসক ছিলেন সামন্ত রাজারা।

এইসব সামন্ত রাজার সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম থেকে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত হোয়াং-হো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে প্রায় দু' হাজার ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়। এইসব ক্ষুদ্র রাজ্যের ওপর দশ-বারোটি বড় রাজ্য প্রাধান্য বিস্তার করে। ঐসব রাজ্যের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ ও হানাহানি চলতে থাকায় দেশে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। প্রধান প্রধান সামন্ত রাজারা নিজেদের মধ্যে সন্ধি ক'রে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা সফল হয় না। দেশকে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির হাত থেকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, সে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনীষীরাও চিন্তা করতে থাকেন। এইসব মনীষীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কনফুসিয়াস।

কনফুসিয়াস খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে লু-রাজ্যে একটি অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যুবা বয়সে লু-রাজ্যে রাজকর্মচারী-

রূপে নানা বিভাগে কাজ করেন ও শেষে রাজ্যের প্রধান বিচারপতি হন। দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি ও অশান্তি দেখে তিনি কতকগুলি মত ও আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। সেই মত ও আদর্শ প্রচারই তাঁর ব্রত হয়ে ওঠে।

কন্‌ফুসিয়াসের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, দেশবাসীর চরিত্রগত দুর্বলতাই দেশের এই বিশৃঙ্খলা ও দুর্দশার জন্য দায়ী। তিনি বলেন, মানুষ স্বভাবত সৎ ও মহৎ। অনুশীলন ও শিক্ষার দ্বারাই এই সততা ও মহত্ত্বকে চরিত্রে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাই তিনি সততা, সৎকার্য, সু-নীতি ও সুশিক্ষার ওপরই জোর দেন। সততা, সু-নীতি, সুশিক্ষা ও সৎকার্যের আদর্শ কঠোর-ভাবে মেনে চললেই দেশে আদর্শ প্রজা, আদর্শ রাজা ও আদর্শ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হ'তে পারে। তিনি সততা, সু-নীতি ও সু-রীতির আদর্শগুলি কঠোরভাবে পালনের নির্দেশ দেন।

কন্‌ফুসিয়াস

তিনি যখন লু-রাজ্যের প্রধান বিচারপতি ছিলেন, তখন পার্শ্ববর্তী এক রাজ্যের রাজা লু-রাজ্যের রাজার কাছে কয়েকজন নর্তকী পাঠান। লু-রাজ ঐসব নর্তকী নিয়ে আমোদ-প্রমোদে মত্ত থেকে রাজকার্যে কয়েকদিন অবহেলা করেন। রাজা রাজার কর্তব্য পালনে অবহেলা করায় কন্‌ফুসিয়াস পদত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স তিপ্পান্ন বছর।

তারপর তিনি চোদ্দ বছর তাঁর মত ও আদর্শকে কাজে পরিণত করতে পারেন এমন একজন শাসকের সন্ধানে চীনদেশে ঘুরে বেড়ান। এইরকম কোনো আদর্শ শাসকের সন্ধান না পেয়ে তিনি আবার লু-রাজ্যে ফিরে আসেন; কিন্তু সরকারী কাজ না নিয়ে শিক্ষালয় খুলে বসেন। দলে দলে লোক এসে এখানে শিক্ষা নেয়। কন্‌ফুসিয়াসের চিন্তাধারা সারা দেশে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৭৯ অব্দে ৭২ বছর বয়সে কন্‌ফুসিয়াসের মৃত্যু হয়।

২. চিন্ রাজবংশ—শি হুয়াংতি—চীনের প্রাচীর

অবশেষে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে **চিন্** রাজবংশের রাজত্বকালে চীন দেশের বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দূর হয়। চিন্-বংশীয় রাজারা সমগ্র চীনে অধিকার বিস্তার করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ২৪৬ অব্দে এই বংশের এক রাজা শি হুয়াংতি বা **প্রথম সম্রাট** উপাধি গ্রহণ করেন। প্রকৃত পক্ষে তিনিই ছিলেন চীনের প্রথম সম্রাট। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে সামন্তরাজদের শাসন থেকে মুক্ত করেন এবং ছত্রিশটি প্রদেশে ভাগ ক'রে নিজের মনোমত শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সমগ্র দেশে যোগাযোগ-ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলার জন্যে বড় বড় রাজপথ নির্মাণ করেন। সারা দেশে সেচ ও জলনিকাশের ব্যবস্থা করেন। প্রজাদের অবস্থা ও অভিযোগ জানার জন্যে তিনি প্রায়ই ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনীর প্রবর্তন করেন। এর ফলে কেবল যুদ্ধ জয় নয়, সারা দেশে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষাও সহজ হয়।

চীনের উত্তরে ও পশ্চিমে ছিল দুর্ধর্ষ হূণ ও তাতার জাতির বাস। তারা প্রায়ই উত্তর দিক থেকে চীনদেশে হানা দিত, লুঠতরাজ করত। এই বৈদেশিক আক্রমণ থেকে চীনদেশকে রক্ষার জন্য শি হুয়াংতি পূর্বে সমুদ্র
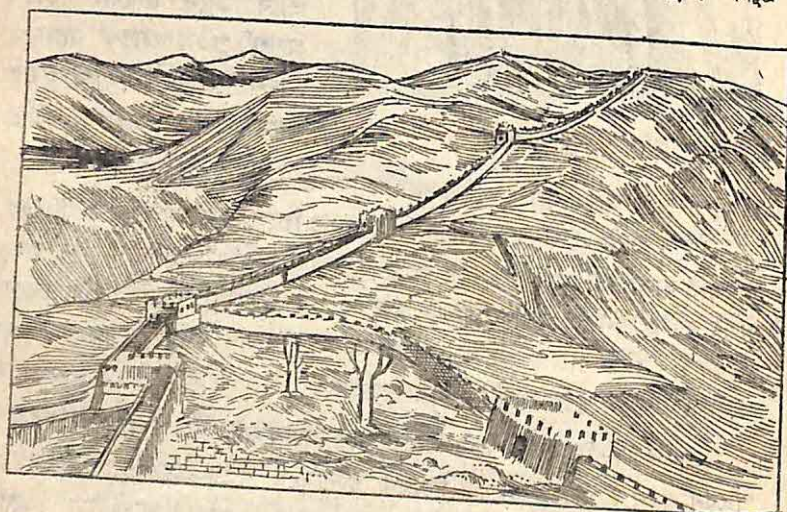
চীনের প্রাচীর

থেকে পশ্চিমে গোবি মরুভূমি পর্যন্ত একটি দু' হাজার মাইলেরও বেশি দীর্ঘ প্রাচীর নির্মাণ করেন। প্রাচীরের উচ্চতা ছিল ১৫ থেকে ২০ ফুট। এই প্রাচীর এতই সুপ্রশস্ত ছিল যে, প্রাচীরের উপর প্রহরীদের থাকার

জন্য প্রায় দু’ হাজার বড় ও এক হাজার ছোট ঘাঁটি ঘর ছিল। এক-একটি বড় ঘাঁটি ঘরে একশ জন পর্যন্ত সৈনিক থাকতে পারত। এই প্রাচীর অনেক স্থানে ভগ্ন হলেও বিশ্বের অন্যতম বিস্ময় ব’লে আজও পরিগণিত।

শি হুয়াংতি যেসব যুগান্তকারী কাজ করেছিলেন, তাতে প্রাচীন-পন্থী মানুষরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তাই বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই পূর্ববর্তী যুগকে সুবর্ণ যুগ ব’লে প্রচার করছিল। এই বিরুদ্ধ প্রচার বন্ধ করার জন্য শি হুয়াংতি প্রায় চারশ পণ্ডিতকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং রাজনীতির গন্ধ আছে এমন ইতিহাস ও দর্শনের সমস্ত বই পুড়িয়ে ফেলেন।

শি হুয়াংতির মৃত্যুর পরে চিন্ বংশীয়রা দুর্বল হয়ে পড়ে। চীনে হান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় (খ্রীষ্টপূর্ব ২০৬)।

অনুশীলনী

১। চীনে বিশৃঙ্খলার যুগ বলতে কি বোঝ?

২। কন্‌ফুসিয়াস কে ছিলেন? তিনি কি আদর্শ প্রচার করেন? তাঁর জীবন সম্পর্কে কি জান?

৩। শি হুয়াংতি নাম কে গ্রহণ করেছিলেন? কেন গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কি জন্য বিখ্যাত হয়েছেন?

৪। চীনের প্রাচীর কি? কেন এই প্রাচীর তৈরি করা হয়েছিল? কে এই প্রাচীর তৈরি করেছিলেন?

৫। চীনের প্রাচীর সম্পর্কে যা জান লিখ।

৬। শূন্য স্থান পূরণ কর:

(ক) চীনদেশের — রাজ্যে কন্‌ফুসিয়াস জন্মগ্রহণ করেন।

(খ) চীনের মহাপ্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন — —।

(গ) কন্‌ফুসিয়াস শেষ জীবনে তাঁর আদর্শ প্রচারের জন্য — স্থাপন করেন।

৭। চীনের মনীষীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কে?

৮। কত বছর বয়সে কনফুসিয়াসের মৃত্যু হয়?

৯। চীনের উত্তরে ও পশ্চিমে কোন্ দুর্ধর্ষ জাতির বাস ছিল?

১০। কে চীনের দীর্ঘ প্রাচীর নির্মাণ করেন?

১১। শূন্যস্থান পূরণ কর:

ক. খ্রীষ্টপূর্ব — থেকে — অব্দ পর্যন্ত শ্যাং রাজবংশ চীনে রাজত্ব করেছিলেন।

খ. চীন দেশের প্রকৃত শাসক ছিলেন —।

গ. চীনের প্রাচীরের উচ্চতা ছিল — থেকে — ফুট।

দশম পরিচ্ছেদ

ভারত

১. আর্যদের ভারতে আগমন

আর্য জাতির লোকেরা দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে পারস্যে প্রবেশ করেছিল। আর্য জাতির একটি দল ভারতেও প্রবেশ করেছিল। পারসিকদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা ও ভারতীয় আর্যদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদের ভাব ও ভাষার মধ্যে অনেক মিল আছে। তাই মনে হয়, এই দলটি পারস্যের পথেই ভারতে প্রবেশ করেছিল।

আর্যরা সম্ভবত এখন থেকে চার হাজার বছর আগে ভারতে এসেছিল। ঐ সময়ে-উত্তর-পশ্চিম ভারতে সিন্ধু উপত্যকার সুপ্রাচীন সভ্যতা বিরাজ করছিল। অনেকের ধারণা, দ্রাবিড় জাতির লোকেরাই সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। আর্যরা লোহার ও ঘোড়ার ব্যবহার জানত। তারা যাযাবর ও পশুপালক ছিল। তাদের আক্রমণে সিন্ধু অঞ্চলের নাগরিক সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল এবং দ্রাবিড়রা ক্রমেই দক্ষিণে ও পূর্বে সরে গিয়েছিল। যে অনার্য জাতির সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকায় আর্যদের লড়াই করতে হয়েছিল, বেদে তাদের 'কৃষ্ণকায়', 'অনাস' (চাপা নাকযুক্ত) ও 'দস্যু' বলা হয়েছে। আর্যরা তাঁদের দেবরাজ ইন্দ্রকে বলেছেন, পুরন্দর বা নগর-ধ্বংসকারী। এই নগরগুলি সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলের নগরগুলিই ছিল মনে হয়।

আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদে আফগানিস্থানের কাবুল নদী এবং পাঞ্জাবের পঞ্চনদের বহু উল্লেখ আছে। গঙ্গা ও যমুনার উল্লেখও পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায়, ভারতীয় আর্যরা প্রথমে আফগানিস্হান ও পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করেছিল। তারপর তারা ক্রমেই পূর্বে অগ্রসর হয়ে সারা উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এইভাবে উত্তর ভারতের নাম হয়েছিল আর্যাবর্ত।

২. বেদ

ভারতে আসার কিছুকাল পরে আর্যরা তাদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদ রচনা করেছিল। বেদের প্রাচীনতম অংশ ঋগ্বেদ এখন থেকে মনে হয়

সাড়ে তিন হাজার বছর আগে রচিত হয়েছিল। 'বেদ' শব্দের অর্থ জ্ঞান।

বেদ চার ভাগে বিভক্ত—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব। বেদগুলিতে প্রধানত দেবতার উদ্দেশে ভবস্তুতি ও উপাসনার মন্ত্রাদি আছে। ঐগুলিকে বলা হয় সূক্ত। ঋগ্বেদে ১০২৮টি সূক্ত আছে। অন্যান্য বেদের সূত্রগুলির অধিকাংশই ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া হয়েছে। সাম বেদের সূত্রগুলি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে গাওয়া হ'ত। যজুর্বেদে কিছু সুললিত গদ্যও আছে। অথর্ববেদে মন্ত্রতন্ত্র ও যাদুবিদ্যাও আছে।

বেদগুলি লিখেরাখা হ'ত না। সেগুলি শুনে শিখতে ও মনে রাখতে হ'ত। তাই বেদের এক নাম শ্রুতি।

বেদগুলি ক্রমেই বিকাশ লাভ করছিল এবং তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্গুলি যুক্ত হয়েছিল। প্রত্যেক বেদেরই ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ আছে। ব্রাহ্মণে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকান্ডের কথা আছে। আরণ্যকে আছে সৃষ্টি, সত্য প্রভৃতি সম্পর্কে নানা তত্ত্ব। আরণ্যকগুলি ব্রাহ্মণের সঙ্গেই যুক্ত। এগুলি অরণ্যবাসী আর্যদের জন্য রচিত। বেদের শেষাংশ উপনিষদ্ বা বেদান্ত। এগুলিতে আত্মা, ব্রহ্ম, সৃষ্টি, সত্য প্রভৃতি সম্পর্কে গভীর আলোচনা আছে।

৩. গোড়ার যুগে আর্যদের সমাজ, ধর্ম ও রাজনৈতিক সংগঠন

সমাজ: আর্যরা মূলত পশুপালক যাযাবর হ'লেও ভারতে এসে স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের জীবিকা হয়ে উঠেছিল কৃষি, পশুপালন ও শিল্প। সমাজের ক্ষুদ্রতম অংশ ছিল পরিবার। বাবাই পরিবারের কর্তা ছিলেন। মারও যথেষ্ট সম্মান ছিল। আর্যরা পুত্র কামনা করলেও কন্যাকে অবহেলা করতেন না। কন্যাদের চিরকুমারী থাকার ও বিদ্যার্জনের সুযোগ ছিল। ঐ যুগে মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি বহু বিদুষী রমণী জন্মেছিলেন। পুরুষরা সাধারণত একটি বিবাহ করতেন। তবে পুরুষের বহুবিবাহ ও স্ত্রীলোকের বিধবা-বিবাহও প্রচলিত ছিল।

আর্যরা গৌরবর্ণ ও অনার্যরা কৃষ্ণবর্ণ ছিল। পরাজিত অনার্যরা আর্য সমাজে স্থান পেয়েছিল। তাই আর্য ও অনার্যদের মধ্যে পার্থক্য রাখার জন্য বর্ণভেদের সৃষ্টি হয়েছিল। পরে কাজ ও গুণ ভেদে বর্ণভেদ প্রচলিত হয়।

আর্য সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণে বিভক্ত করা হয়। যারা বিদ্যাচর্চা, উপাসনা ও যাগযজ্ঞাদি নিয়ে রইলো তারা হ'লো ব্রাহ্মণ ; যারা দেশরক্ষা, দেশশাসন ও যুদ্ধবিদ্যা নিয়ে রইলো তারা হ'লো ক্ষত্রিয় ; যারা কৃষি, পশুপালন ও ব্যবসা নিয়ে রইলো, তারা হ'লো বৈশ্য ; আর যেসব অনার্য আর্যসমাজে নিম্নতম স্তরে ঠাঁই পেয়েছিল, তারা হ'লো শূদ্র। শ্রমশিল্প ও পরিচর্যাদি হ'ল শূদ্রের কাজ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন উচ্চবর্ণের আর্যদের জীবনকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হ'ল। তারা যখন বাল্যে গুরুগৃহে থেকে সংযম ও শুচিতার মধ্যে থেকে শিক্ষালাভ করতো, সেই সময়টিকে বলা হতো **ব্রহ্মচর্য**। শিক্ষাশেষে তাদের গৃহস্থ জীবনকে বলা হতো **গার্হস্থ্য**। প্রৌঢ় বয়সে তারা যখন বনে প্রস্থান করতো, তাকে বলা হ'তো **বানপ্রস্থ**। শেষ বয়সে যখন তারা সন্ন্যাসী হ'তো, তাকে বলা হ'তো **সন্ন্যাস** বা **যতি**।

ধর্ম ঃ প্রথম যুগে আর্যরা প্রাকৃতিক শক্তিগুলিরই পূজা করতো। তাদের প্রধান দেবতা ছিলেন **দ্যৌ** (আকাশ), **মিত্র** (সূর্য), **ইন্দ্র** (বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুতের দেবতা), **বরুণ**, **মরুৎ** (বায়ু), **অগ্নি**, **পৃথিবী**, **রুদ্র** ইত্যাদি। এঁদের কোন মূর্তি বা মন্দির ছিল না। এঁদের উদ্দেশে স্তবস্তুতি যাগযজ্ঞ ও বলিদান করা হতো। পরে আর্যরা এক ঈশ্বর বা ব্রহ্মের চিন্তা করেন।

রাজনৈতিক সংগঠন ঃ বৈদিক যুগে রাজনৈতিক সংগঠনের ক্ষুদ্রতম অংশ ছিল গ্রাম। গ্রামের প্রধানকে বলা হ'ত **গ্রামণী**। কতকগুলি গ্রাম নিয়ে গঠিত হতো **বিশ্** বা **জন**। বিশ্ ও জনের প্রধানকে বলা হতো **বিশ্পতি** বা **রাজন্**। দেশে প্রধানত রাজতন্ত্রই প্রচলিত ছিল। রাজাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য সভা ও সমিতি থাকত। রাজার প্রধান মন্ত্রীকে বলা হ'ত **পুরোহিত**। রাজারা প্রবল হয়ে অধিকার বিস্তার করতেন এবং একরাট্, সম্রাট্ প্রভৃতি নামে পরিচিত হতেন। তাঁদের একচ্ছত্র প্রভুত্ব প্রকাশের জন্য রাজসূয়, অশ্বমেধ বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞ করতেন।

কিছু কিছু প্রজাতন্ত্রও ছিল। প্রজাতন্ত্রের প্রধানকে বলা হ'ত গণজ্যেষ্ঠ।

৪. মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত

ভারতীয় আর্যদের প্রাচীন দুই মহাকাব্যের নাম **রামায়ণ** ও **মহাভারত**। এগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। **বাল্মীকি** রামায়ণ ও **বেদব্যাস** মহাভারত রচনা করেছিলেন বলা হয়। তবে এগুলি সম্ভবত অনেক দিন ধ'রে অনেক কবির দ্বারা রচিত হয়েছিল এবং শেষে গুপ্ত যুগে বর্তমান রূপ লাভ করে-

ছিল। এই দুই মহাকাব্যে বর্ণিত কাহিনী থেকে প্রাচীন আর্য সমাজ সম্পর্কে নানা কথা জানা যায়।

রামায়ণ মহাকাব্যে আর্য ও অনার্যদের মধ্যে যুদ্ধ এবং শেষে সারা ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তারের কাহিনী আছে। মহাভারতে আছে, আর্য রাজগণের মধ্যে যুদ্ধ এবং সারা ভারতে একটি আর্যরাজবংশের আধিপত্য বিস্তারের কাহিনী। এই দুই মহাকাব্যেই এক ঐক্যবদ্ধ আর্যশাসিত ভারতের কল্পনা করা হয়েছে।

মহাকাব্যগুলিতে দেখা যায়, বর্ণভেদের কঠোরতা হ্রাস পেয়েছে। ক্ষত্রিয় রাজা জনক রাজর্ষি হয়েছেন এবং দ্রোণ, অশ্বত্থামা, পরশুরাম প্রভৃতি ব্রাহ্মণরা যুদ্ধবিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। রাজা শান্তনু ধীবরকন্যাকে বিবাহ করেছেন। তবে শূদ্রদের সম্পর্কে ঘৃণা ও কঠোরতা বিশেষ হ্রাস পায় নি। একলব্য, কর্ণ, শম্বুক প্রভৃতির জীবন তার প্রমাণ। সমাজে ব্রাহ্মণদের চেয়ে ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য বেড়েছিল। দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয় কৌরবদের কাছে চাকরি করতেন। মহাকাব্যের যুগে বৈদিক যুগের অনেক দেবতা তাঁদের প্রাধান্য হারিয়েছিলেন। এ যুগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রধান দেবতা হয়ে উঠেছিলেন এবং ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতারা দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতায় পরিণত হয়েছিলেন।

লঙ্কা, ইন্দ্রপ্রস্থ, অলকা প্রভৃতির বর্ণনা থেকে জানা যায়, ঐসময় দেশে বড় বড় নগর গ'ড়ে উঠেছিল। রাজাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রজার মঙ্গল সাধন। রামচন্দ্র প্রজার মনস্তুষ্টির জন্য পত্নী সীতাকেও ত্যাগ করেছিলেন। অতি দুষ্ট দুর্যোধনও কখনও প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করেন নি। যুদ্ধে পদাতিক, হস্তী, অশ্ব ও রথ ব্যবহৃত হতো। তীর-ধনুকই ছিল প্রধান অস্ত্র। গদা. চক্র প্রভৃতিও ব্যবহৃত হতো। বীররা শঙ্খধ্বনি করতেন। সারাদিন যুদ্ধের পর রাত্রিতে যুদ্ধ বন্ধ থাকত। নিরস্ত্রকে বধ করা অন্যায় মনে করা হতো। স্বয়ংবর নামে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল, তাতে কন্যা বরদের মধ্য থেকে নিজ ইচ্ছামত একজনকে স্বামী ব'লে গ্রহণ করতেন। সত্যপালনকে ধর্ম মনে করা হ'ত। পিতামাতা, স্বামী ও দাদাকে ভক্তি করা ছিল শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মৃগয়া ও দ্যূতক্রীড়া খুবই প্রিয় ছিল। রানীদেরও গৃহকর্ম করতে হ'ত। দ্রৌপদী সুপাচিকা ছিলেন।

৫. জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান

বৈদিক যুগের শেষের দিকে, এখন থেকে আড়াই হাজার বছর আগে, সমাজে বলিদান ও যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণরা

অব্রাহ্মণদের ঘৃণার চোখে দেখত। জীবহিংসা ও মানুষের প্রতি ঘৃণা কখনও ধর্ম হ'তে পারে না। উপনিষদের ঋষিরা পুনর্জন্ম ও কর্মফলের কথাও বলেছিলেন। অর্থাৎ জীব বার বার জন্মগ্রহণ করে এবং নিজ কর্ম অনুসারে পরজন্মে তার ঊর্ধ্বগতি বা অধোগতি হয়। ফলে মানুষের মনে নানা চিন্তা ভাবনা দেখা দিয়েছিল। দেশে বহু ধর্মমতের উদ্ভব হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম প্রধান।

জৈনধর্ম : জৈনধর্মের প্রবর্তকের নাম মহাবীর। তবে মহাবীরের আগে তেইশজন জৈন ধর্মগুরু বা তীর্থংকর জন্মেছিলেন বলা হয়। যাই হ'ক, মহাবীরের প্রকৃত নাম বর্ধমান। এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে তিনি বৈশালীর কাছে 'জ্ঞাতৃক' নামে এক ক্ষত্রিয়-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা সিদ্ধার্থ ঐ ক্ষত্রিয়-কুলের নায়ক ছিলেন। তাঁর মা ত্রিশলা ছিলেন লিচ্ছবিরাজ-কন্যা। উত্তর ভারতের বহু রাজরাজড়াই তাঁর আত্মীয় ছিলেন। যশোদা নামে এক কন্যার সঙ্গে বর্ধমানের বিবাহ হয়। তাঁদের একটি কন্যাও জন্মে।

মহাবীর

কিন্তু বর্ধমানের মনে বৈরাগ্য দেখা দেয় এবং তিনি সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হন। তিনি বহু স্থানে ভ্রমণ ও তপস্যা করেন। ৪২ বৎসর বয়সে তিনি কৈবল্য বা পরম জ্ঞান লাভ করেন। তিনি কঠোর সংযমের দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় মহাবীর ও জিন (জয়ী)। জিন শব্দ থেকেই জৈন শব্দের উৎপত্তি। মহাবীরের ধর্মমতে বিশ্বাসীরা জৈন ও তাঁর ধর্মমত জৈনধর্ম নামে পরিচিত। অহিংসা, সত্যবাদিতা, অচৌর্য (চুরি না করা), ত্যাগ ও কঠোর সংযমই তাঁর ধর্মের মূলকথা। তিনি বলেন, বস্তু মাত্রেরই আত্মা আছে। ঈশ্বর ব'লে কিছু নেই ; মানবাত্মার পূর্ণতম বিকাশই ঈশ্বর। তিনি বেদকে ঈশ্বরের বাণী ব'লেও বিশ্বাস করেন

না। বসনভূষণকেও তিনি বন্ধন মনে করেন। তাই উলঙ্গ থাকা জৈনধর্মের অন্যতম আদর্শ।

৭০ বছর বয়সে বিহারে রাজগিরের কাছে পাবা নামক স্থানে মহাবীরের মৃত্যু হয়।

মহাবীরের জীবদ্দশাতেই জৈনধর্ম উত্তর ভারতের অনেক স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত, কলিঙ্গরাজ খারবেল প্রভৃতির উৎসাহে জৈনধর্ম উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বিস্তার লাভ করে। তবে জৈনধর্ম ভারতের বাইরে কোথাও প্রচারিত হয়নি। পরে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার ও হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের ফলে জৈনধর্ম প্রায় লোপ পায়। বর্তমান গুজরাট ও রাজস্থানে কিছুসংখ্যক জৈনধর্মাবলম্বী আছেন।

বৌদ্ধধর্ম : বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক **সিদ্ধার্থ গৌতম** মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর বাবা **শুদ্ধোদন** ছিলেন শাক্যকুলের নেতা। তাঁর রাজধানী ছিল কপিলাবস্তুতে। নেপালের তরাই অঞ্চলে লুম্বিনীতে এক বৈশাখী পূর্ণিমায় শুদ্ধোদনের পত্নী মায়া দেবীর গর্ভে সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। জন্মের কয়েকদিন বাদে মায়া দেবীর মৃত্যু হ'লে সিদ্ধার্থ তাঁর বিমাতা ও মাসী মহাপ্রজাপতি গৌতমীর কাছে প্রতিপালিত হন। ভোগসুখে তাঁর বাল্য ও কৈশোর কাটে। তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। গোপা বা যশোধরা নামে এক আত্মীয়কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। আবাল্য ভোগসুখে লালিত হ'লেও মানুষের জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু তাঁর মনকে ব্যাকুল করে। মানুষ কি ভাবে এগুলির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে, তা-ই হয় তাঁর চিন্তা। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করেন। এই সময়ে তাঁর একটি পুত্র হয়। তিনি পুত্রের নাম রাখেন **রাহুল** (বাধা)। সংসারের বাধা ক্রমে বাড়ছে দেখে তিনি একদা গোপনে সংসার ত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাসী হন। তখন তাঁর বয়স ঊনত্রিশ বছর। তিনি বহু স্থানে ভ্রমণ ও

গৌতম বুদ্ধ

তপশ্চর্যা করেন। অবশেষে গয়ার কাছে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে এক বটবৃক্ষতলে বোধি বা পরম জ্ঞান লাভ করেন। বোধি লাভ করায় তাঁর নাম হয় বৌদ্ধধর্ম। তার ধর্মের নাম হয় বুদ্ধ। তিনি কাশীর কাছে সারনাথে তাঁর বাণী প্রথম প্রচার করেন। পরবর্তী ৪৫ বছর তাঁর ধর্মপ্রচারে কাটে। ৭২ বছর বয়সে উত্তর প্রদেশের গোরখপুরের কাছে কুশীনগরে তাঁর মৃত্যু হয়।

বৌদ্ধধর্মের মূলকথা হ'ল মানুষ মরলে আবার জন্মে ; জন্মে দুঃখ পায় ; দুঃখের হাত থেকে রক্ষা পেতে হ'লে জন্মের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হবে ; মানুষ কর্মের ফলে পরজন্মে ঊর্ধ্বগতি বা অধোগতি লাভ করে এবং পর পর ঊর্ধ্বগতি লাভ ক'রে শেষে জন্মের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। জন্মের হাত থেকে নিষ্কৃতির নামই নির্বাণ। নির্বাণলাভের জন্য বুদ্ধদেব সৎকাজ, সৎচিন্তা, সৎজীবন, সৎসংকল্প, সৎচেষ্টা, সৎস্মৃতি প্রভৃতি আটটি পথ বা উপায় নির্দেশ করেন। তিনি ভোগবিলাস ও কঠোর আত্মপীড়ন, দুয়েরই নিন্দা করেন। ঈশ্বর আছেন কি নেই, সে বিষয়ে নীরব থাকেন। তিনি জাতিভেদ মানেন না।

বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় মগধ, কোশল প্রভৃতি উত্তর ভারতের নানা স্থানে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে অশোক, কণিষ্ক প্রভৃতি সম্রাটদের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম ভারতে ও ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে এবং এশিয়ার প্রধান ধর্মে পরিণত হয়।

৬. মৌর্য, কুষাণ ও গুপ্ত সাম্রাজ্য

মৌর্য সাম্রাজ্য : বুদ্ধদেব যখন জীবিত ছিলেন, তখন ভারতে ষোলটি প্রধান রাজ্য ছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে এখানকার বিহারে মগধ রাজ্যটি ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বুদ্ধের কালে মগধের রাজা ছিলেন **বিম্বিসার**। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর সময়ে মগধ রাজ্য উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে ছোটনাগপুর পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অজাতশত্রুর পুত্র বা পৌত্র উদয়ীভদ্র পাটলিপুত্রে মগধের রাজধানী স্থাপন করেন। উদয়ীভদ্রের বংশধরকে হত্যা ক'রে শিশুনাগ মগধের রাজা হন। শিশুনাগবংশীয়দের সময়ে মগধের অধিকার আরো বিস্তৃত হয়। শিশুনাগবংশীয় শেষ রাজা কাকবর্ণীকে হত্যা ক'রে মহাপদ্ম নন্দ রাজা হন। সম্ভবত তিনি জাতিতে নাপিত ছিলেন। যাই হ'ক তিনি বীর ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে মগধ অধিকারের পূর্বে ভাগীরথী থেকে পশ্চিমে পাঞ্জাবের বিপাশা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাপদ্ম নন্দের মৃত্যুর পর তাঁর আট পুত্র পর

পর রাজা হন। তাঁর শেষ পুত্র ধন নন্দের সময়েই আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। সম্ভবত তাঁরই বিশাল সৈন্যবাহিনীর কথা শুনে গ্রীক সৈনিকরা ভারতের ভেতরে অগ্রসর হ'তে অসম্মত হয়।

ধন নন্দ সম্ভবত খুবই অত্যাচারী ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত নামে এক বীর রাজপুত্র চাণক্য নামে এক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের সাহায্যে ধন নন্দকে পরাজিত ক'রে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন (আঃ খ্রীঃ পূঃ ৩২৪)। অনেকের মতে, চন্দ্রগুপ্ত মৌরীয় নামে ক্ষত্রিয়কুলের রাজপুত্র ছিলেন। অনেকের মতে, তিনি ছিলেন নন্দরাজার দাসী-পত্নী মুরার পুত্র। মৌরীয় বা মুরা নাম থেকে চন্দ্রগুপ্ত-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ মৌর্য বংশ নামে পরিচিত হয়েছে।

তাঁর সাম্রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত গ্রীক-শাসিত ভারতীয় অঞ্চলও মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত জয় করেন। দক্ষিণে তাঁর সাম্রাজ্য কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক-শাসিত ভারতীয় অঞ্চল জয় করায় সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধে কে জয়ী হয়েছিল ঠিক বলা যায় না। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তকে হিরাট, বালুচিস্থান ও কান্দাহার ছেড়ে দিয়েছিলেন। অন্যপক্ষে, চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে ৫০০ হাতি দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিবাহগত সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল। এইভাবে মৌর্য সাম্রাজ্য পশ্চিমে আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এর পূর্বে এতো বড় সাম্রাজ্য ভারতে কেউ স্থাপন করতে পারেন নি।

মহারাজ অশোক

সম্ভবত চন্দ্রগুপ্ত পঁচিশ বছর রাজত্ব করেন। তিনি শেষ বয়সে জৈনধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতে শ্রবণবেলগোলা নামক স্থানে অনশনে দেহত্যাগ করেন।

চন্দ্রগুপ্তের পর রাজা হন তাঁর পুত্র বিন্দুসার। বিন্দুসারের মৃত্যু হ'লে তাঁর পুত্র অশোক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুসীমকে হত্যা ক'রে সিংহাসন অধিকার

করেন। প্রথম জীবনে অশোক নাকি খুবই নিষ্ঠুর ও দুরন্ত ছিলেন। তাই তাঁর নাম ছিল 'চণ্ডাশোক'। ঐ সময়ে উড়িষ্যার দক্ষিণে কলিঙ্গ নামে একটি রাজ্য ছিল। অশোক কলিঙ্গ অধিকার করতে গেলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অশোক জয়ী হন। কিন্তু যুদ্ধে প্রায় এক লাখ সৈন্য নিহত ও প্রায় দেড় লাখ সৈন্য বন্দী হয়। যুদ্ধের পরে দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে লক্ষ
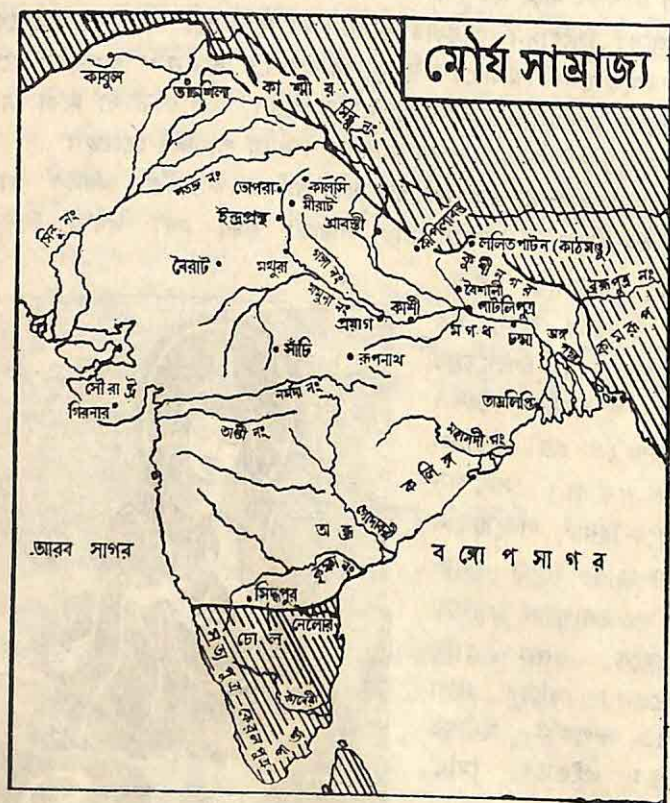
লক্ষ লোক মারা যায়। অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ও দুঃখ-দুর্দশায় অশোক কাতর হন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তখন থেকে তিনি যুদ্ধ ত্যাগ করেন এবং মানুষের মঙ্গল-সাধনই তাঁর ব্রত হয়ে ওঠে। তিনি বুদ্ধের বাণী ও নানা নৈতিক উপদেশ রাজ্যময় পাহাড়ে ও পাথরের থামে খোদাই ক'রে দেন। ঐসব অনেক স্তম্ভ ও লিপি আজও বর্তমান আছে। অশোক দেশ-বিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। সারা সাম্রাজ্যে তিনি জীবহিংসা নিষিদ্ধ করেন। প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বহু কূপ খনন ও পথঘাট নির্মাণ করেন। পথের ধারে অসংখ্য বৃক্ষ রোপন

করেন। প্রজাদের ও জীবজন্তুর চিকিৎসার জন্য বহু হাসপাতাল স্থাপন করেন। গরীব প্রজাদের সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন।

অশোক বিশাল সৈন্যবাহিনীর অধিকারী ছিলেন। তবু তিনি শান্তি ও মানুষের মঙ্গল সাধনের নীতি গ্রহণ করায় তাঁকে ঐতিহাসিকরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট আখ্যা দিয়েছেন। অশোক প্রায় চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

কুষাণ সাম্রাজ্য ঃ অশোকের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। দেশে ছোট-বড় অনেক রাজ্য দেখা দেয়। মগধে শুঙ্গ এবং দক্ষিণ ভারতে **সাতবাহন** রাজারা রাজত্ব করতে থাকেন। এই সুযোগে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে পহ্লব, বাহ্লীক-গ্রীক, শক ও কুষাণ জাতির লোকেরা ভারতে প্রবেশ ক'রে রাজ্য স্থাপন করে। এরা বিদেশী হ'লেও ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম গ্রহণ করে। এইসব বিদেশীদের মধ্যে **কুষাণরা** ভারতে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। কুষাণ রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন **কণিষ্ক**।

কণিষ্কের রাজধানী ছিল পুরুষপুর (পেশোয়ার)। তিনি কাশ্মীর জয় করেন। তাঁর বিজয়বাহিনী পূর্বে পাটলিপুত্র পর্যন্ত অগ্রসর হয়। তাঁর সাম্রাজ্য পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চীনাদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়ে তিনি মধ্য-এশিয়ার খোটান, কাশগর ও ইয়ারকন্দ জয় করেন। কণিষ্কের প্রায় সমস্ত জীবন যুদ্ধে অতিবাহিত হয়। তিনি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজত্ব করতেন।

জীবনের অধিকাংশ সময় যুদ্ধে অতিবাহিত করলেও তিনি বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর সময়েই 'মহাযান' বৌদ্ধধর্মমত প্রাধান্য পায়। পূর্বে বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের (বুদ্ধের পূর্ববর্তী জীবন) মূর্তিনির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল। মহাযান ধর্মমতে বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ ও পূজা চালু হয়। দেশে অসংখ্য অপরূপ বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি নির্মিত হ'তে থাকে। কণিষ্ক তাঁর সাম্রাজ্যে বহু মঠ ও স্তূপ নির্মাণ করেন। তিনি সাহিত্যেরও উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কবি ও নাট্যকার অশ্বঘোষ তাঁর সভাকবি ছিলেন।

কণিষ্কের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এর পর প্রায় দু'শ বছর ভারতে কোনও শক্তিশালী সাম্রাজের অভ্যুদয় হয় নি।

গুপ্ত সাম্রাজ্য ঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ায় মগধে গুপ্তবংশীয় রাজা **চন্দ্রগুপ্ত** একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। সম্ভবত বিহার উত্তরবঙ্গ ও উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ তার শাসনাধীন ছিল। তাঁর রাজধানী

ছিল পাটলিপুত্র। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **সমুদ্রগুপ্ত** রাজা হন। সমুদ্রগুপ্ত বাহুবলে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এলাহাবাদে অশোকস্তম্ভের গায়ে সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণের একটি প্রশস্তি খোদাই করা আছে। তাতে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের বিবরণ আছে। সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারতের বহু রাজ্য অধিকার করেন। দক্ষিণ ভারতের বহু রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার ক'রে নেন। দিগ্‌বিজয় শেষে সমুদ্রগুপ্ত হিন্দুধর্মের নিয়ম অনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। গুপ্ত সম্রাটদের সময়ে দেশে পুনরায় হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে।

সমুদ্রগুপ্ত

সমুদ্রগুপ্ত কেবল দিগ্‌বিজয়ী বীর ছিলেন না। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় **চন্দ্রগুপ্ত** রাজা হন। তিনি শকদের পরাজিত ক'রে মালব অধিকার করেন এবং 'শকারি' (শকদের নিধনকারী) উপাধি নেন। মালবের উজ্জয়িনীতে তিনি তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। কাহিনী-কিংবদন্তীতে যে বিক্রমাদিত্যের গল্প প্রচলিত আছে, ইনিই সেই বিক্রমাদিত্য ব'লে অনেকে মনে করেন। মহাকবি কালিদাস তাঁর সভাকবি ছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **কুমারগুপ্ত** ও পৌত্র **স্কন্দগুপ্ত** সম্রাট হন। এঁদের সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। স্কন্দগুপ্তের সময়ে ভারতের বাইরে থেকে **হূণ** জাতির লোকেরা ভারত আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত হূণদের পরাজিত করেন।

কিন্তু স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। গুপ্তবংশীয় রাজাদের অযোগ্যতা, প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও অধীন রাজাদের বিদ্রোহ ও হূণ জাতির আক্রমণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ।

৭. প্রাচীন বাংলাদেশের ইতিহাস

প্রাচীন বাংলার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র এবং গ্রীক লেখকদের রচনা থেকে প্রাচীন বাংলা সম্পর্কে অনেক কথা জানা গেছে।

আর্যদের বসতি বিস্তারের আগে বাংলাদেশে অনার্য জাতির লোক বাস করত। কিছু দ্রাবিড় ও তিব্বত-বর্মী জাতির লোকও ছিল। আর্যরা এদের অসভ্য ও অশুচি মনে করত। আর্যরা বাংলাদেশে বসতি বিস্তারের পর বাংলাদেশ আর্যাবর্তের অংশ ব'লে স্বীকৃত হয়।

মহাভারত ও রামায়ণে বাংলাদেশের উল্লেখ আছে। মহাভারতের যুগে উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্র বাসুদেব নামে এক রাজা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বধ করেন। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাশ্ব রক্ষার জন্য ভীমকে তাম্রলিপ্ত ও বঙ্গের রাজাদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে হয়।

সিংহলে প্রাপ্ত বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশ থেকে জানা যায়, রাঢ় বা পশ্চিম-বঙ্গের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করেছিলেন। বাঙালীরা যে ঐসময়ে যুদ্ধে ও সমুদ্রযাত্রায় পটু ছিলেন, এ থেকে তা বোঝা যায়।

জৈন গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে পার্শ্বনাথ, মহাবীর প্রভৃতি বহু জৈন তীর্থংকর ও তাঁদের শিষ্যরা বাস করতেন। এখানকার অধিবাসীরা দুরন্ত ছিল। তারা একবার মহাবীরকে প্রহার করেছিল। পার্শ্বনাথ-সহ একাধিক তীর্থংকর এখানকার সমেত পাহাড়ে দেহত্যাগ করেছিলেন। পার্শ্বনাথের নাম অনুসারেই ঐ পাহাড়ের নাম হয়েছে পরেশনাথ।

প্রাচীন গ্রীক লেখকদের লেখা থেকে জানা যায়, আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন বাংলাদেশে গঙ্গরিডই নামে এক জাতির লোক বাস করত। তারা অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিল। তাদের চার হাজার রণহস্তী ও বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল। তাই অন্য কোন রাজা এদেশ জয় করতে সাহস করেন নি।

মৌর্য যুগে বাংলাদেশ যে মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীন ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে বাংলাদেশে গঙ্গরিডই জাতির লোকেরা খুব পরাক্রান্ত ছিল ব'লে গ্রীক লেখক টোলেমির বিবরণ ও পেরিপ্লাস নামক গ্রীক গ্রন্থ থেকে জানা যায়।

গুপ্ত যুগে বাংলাদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলাদেশে অনেক ছোট-বড় রাজ্য দেখা দেয়। এগুলির কোন-কোনটিতে গুপ্তবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন।

৮. বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতের সঙ্গে বিদেশের সম্পর্ক ছিল। মেসো-পটেমিয়া অঞ্চলের সঙ্গে সিন্ধু অঞ্চলের যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত, তা আগেই

বলা হয়েছে। মৌর্য যুগে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয়, পারস্য, মিশর, গ্রীস প্রভৃতি দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ঐসময়ে পারস্য ও গ্রীসের সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখে তাতে অনেকে পারসিক স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। পৌরাণিক হিন্দুধর্মেও মূর্তি ও মন্দির-নির্মাণ শিল্পে ঐসময় গ্রীক প্রভাব প্রচুর পরিমাণে পড়েছিল।

মৌর্যোত্তর যুগে বাহ্লীক-গ্রীক, শক, কুষাণ প্রভৃতি জাতিগুলি মধ্য-এশিয়া থেকে ভারতে এসেছিল। তারা ভারতে এসে ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ধর্মকে গ্রহণ করলেও তারা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গভীর-ভাবে প্রভাবিত করেছিল। ঐসব বিদেশী জাতি ভারতীয় জাতির মধ্যে একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিল। ফলে সামাজিক রীতিনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ঐসব জাতির প্রভাব ছিল অসামান্য। কণিষ্কের সাম্রাজ্য মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ফলে মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারতীয়রা মধ্য-এশিয়ায় বহু উপনিবেশ ও রাজ্য গ'ড়ে তুলেছিল। খোটান, কাশগর কারাশর, ইয়ারকন্দ, কুচা, ইয়াক-আরিফ, নিয়া, তুরফান প্রভৃতি স্থান ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা প্রচারের প্রধান কেন্দ্র ছিল। ঐসব স্থানে ভূগর্ভ থেকে প্রচুর পরিমাণে মঠ, মন্দির, স্তূপ প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ, অসংখ্য মূর্তি ও বহু ভারতীয় ভাষায় ও লিপিতে লেখা পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে। চীনদেশের সীমান্তে তুং হোয়াংয়ে প্রায় পাঁচ শ' গুহাগৃহ আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলির তিনশটি অনুপম চিত্রে ও ভাস্কর্যে সুশোভিত। এখানে প্রায় হাজার বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়েছিল। প্রাচীন কালে মধ্য-এশিয়া বৃহত্তর ভারতের অংশ ছিল।

কনিষ্কের সাম্রাজ্য পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর ও পূর্বে চীনদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকায় ঐ দুই দেশের সঙ্গে ভারতীয়দের বাণিজ্য খুবই বেড়েছিল। গুপ্ত যুগে রোমের সঙ্গে, বিশেষতঃ পূর্ব সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সূক্ষ্মবস্ত্র, মশলা, লোহা, হাতির দাঁত প্রভৃতি ছিল প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। এই বাণিজ্য এতোই ব্যাপক ছিল যে, রোমান স্বর্ণমুদ্রা দিনারের নামে ভারতীয় স্বর্ণমুদ্রার নাম হয়েছিল দিনার। ভারতের নানা স্থানে অসংখ্য রোমান মুদ্রা পাওয়া গেছে।

গুপ্ত যুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গেও যোগাযোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারতীয়রা সমুদ্রপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশ ও দ্বীপের সঙ্গে ব্যবসা চালাতেন। তাঁরা মালয়, ইন্দোচীন, কাম্বোডিয়া, সিয়াম, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি স্থানে বহু উপনিবেশ ও রাজ্য গ'ড়ে তোলেন।

ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মই ঐসব দেশের ধর্ম হয়ে ওঠে। কাম্বোডিয়ার বিখ্যাত বিষ্ণু মন্দির এবং যবদ্বীপের বিখ্যাত বৌদ্ধস্তূপ বরবুদুর এর সাক্ষ্য আজও বহন করছে।

৯. প্রাচীন ভারত সম্পর্কে বৈদেশিক বিবরণ— মেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়েন

মেগাস্থিনিসের বিবরণ : মেগাস্থিনিস মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় সেলুকাসের দূত ছিলেন। তিনি ইণ্ডিকা নামে একটি পুস্তকে ভারত সম্পর্কে বিবরণ লিখে গেছেন। তা থেকে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে অনেক কথা জানা গেছে।

মেগাস্থিনিসের বিবরণে বলা হয়েছে ঐসময় ভারতবাসীরা সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—দার্শনিক, কৃষক, শিকারী ও পশুপালক, শ্রমশিল্পী ও ব্যবসায়ী, সৈনিক, গুপ্তচর ও অমাত্য। দেশে কৃষকের সংখ্যাই ছিল বেশি। তিনি লিখেছেন, ঐসময় ভারতে ক্রীতদাস-প্রথা ছিল না। কিন্তু একথা সত্য নয়। গ্রীস ও রোমের তুলনায় এদেশে ক্রীতদাসের সংখ্যা খুব কম থাকায় সম্ভবত ক্রীতদাস প্রথা তাঁর চোখে পড়ে নি। তিনি ভারতবাসীর উচ্চ প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, তারা ছিল সৎ, সরল ও সত্যবাদী। কৃষকরা ছিল পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী। তাদের অবস্থা মন্দ ছিল না। ভারতীয়রা ছিল শৌখিন ও অলংকারপ্রিয়।

মেগাস্থিনিসের রচনা থেকে জানা যায়, রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল ভারতের বৃহত্তম শহর। এর চারদিকে গভীর খাত ও উচ্চ প্রাচীর ছিল। প্রাচীরে ছিল ৬৪টি তোরণ এবং ৫৭০টি মিনার। সরোবরে ও উদ্যানে শহরটি সুশোভিত ছিল। নগর পরিচালনার জন্য ত্রিশজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পৌরসভা ছিল।

ফা-হিয়েনের বিবরণ : দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন মধ্য এশিয়ার পথে ভারতে এসেছিলেন। তিনি প্রায় পনের বছর ভারতে ছিলেন এবং উত্তর ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেছিলেন। তিনি ভারত সম্পর্কে একটি বিবরণ রেখে গেছেন। ঐ বিবরণ থেকে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে অনেক কথাই জানা যায়। তিনি তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে জাহাজে ক'রে সিংহল ও যবদ্বীপের পথে স্বদেশে ফিরে যান।

তিনি তিন বছর পাটলিপুত্রে থেকে সংস্কৃত শিখেছিলেন। তিনি পাটলিপুত্রে অশোকের রাজপ্রাসাদ দেখে বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, এটি মানুষের তৈরি নয়, দৈত্যের সৃষ্টি। তিনি লিখেছেন, ভারতবাসী খুবই দয়ালু, দানশীল ও অতিথিপরায়ণ ছিল। দেশে বহু পান্থনিবাস ছিল। দণ্ড কঠোর ছিল না। দৈহিক দণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'ত না। কেবল বিদ্রোহ করলে একটি হাত কেটে দেওয়া হ'ত। তবু দেশে চোর-ডাকাতের উৎপাত ছিল না। সকলে সুখে-শান্তিতে বাস করত।

পাঞ্জাব ও বাংলাদেশে বৌদ্ধের সংখ্যা খুব বেশি ছিল। মধ্যভারতে হিন্দুর সংখ্যাই ছিল বেশি। তবে চণ্ডাল ছাড়া অন্য কেউ মাছ-মাংস খেত না। ভারতীয়রা পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন।

১০. প্রাচীন ভারতে শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান

প্রাচীন ভারতে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা প্রভৃতি কলাশিল্পের খুবই উন্নতি হয়েছিল। অশোকস্তম্ভ, অশোকস্তম্ভের চূড়ার মূর্তিগুলি এবং সাঁচী স্তূপ প্রভৃতি দেখলেই বোঝা যায়, মৌর্য যুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের কিরূপ উন্নতি হয়েছিল। কুষাণ যুগে ভাস্কর্য বা মূর্তি-নির্মাণ শিল্পের আরো উন্নতি ঘটে। ঐসময় ভারতীয় ও গ্রীক পদ্ধতির মিলনে গান্ধার শিল্পকলা নামে এক-প্রকার ভাস্কর্যরীতি খুবই বিকাশ পায়। গুপ্ত যুগে মূর্তি-নির্মাণ শিল্পের চরম বিকাশ ঘটে। প্রাচীনকাল থেকেই পাহাড় কেটে গুহামন্দির নির্মাণের রীতি প্রচলিত ছিল। অজন্তার গুহামন্দিরগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চিত্রকলাতেও প্রাচীন ভারত খুবই উন্নত ছিল। অজন্তার গুহামন্দিরের দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্রগুলি বর্ণে, রেখায় ও রূপে আজও আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে।

অজন্তার একটি চিত্র

সাহিত্যেও প্রাচীনকাল থেকেই ভারত অতিশয় উন্নত ছিল। প্রাচীন কালেই রামায়ণ ও মহাভারতের মতো মহাকাব্যগুলি রচিত হয়েছিল। কুষাণ যুগে কণিষ্কের আমলে কবি ও নাট্যকার **অশ্বঘোষ** তাঁর **বুদ্ধচরিত** রচনা করেছিলেন। গুপ্ত যুগে মহাকবি **কালিদাস** রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত নাটক ও কাব্যগুলি। ঐ যুগে নাট্যকার **বিশাখদত্ত**, **শূদ্রক** প্রভৃতিও জীবিত ছিলেন। গুপ্ত যুগেই সংস্কৃত অভিধান **অমরকোষ** রচিত হয়েছিল।

জ্ঞান-বিজ্ঞানেও ভারত পেছনে ছিল না। প্রাচীন ভারতীয়রা **ষড়্দর্শন** রচনা ক'রে তাঁদের অতুলনীয় চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁরা ছন্দ, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ব্যাকরণে **পাণিনির** নাম অমর হয়ে আছে। গুপ্ত যুগে **আর্যভট্ট** ও **বরাহমিহিরের** মতো জ্যোতির্বিদ্ এবং **ব্রহ্মগুপ্তের** মতো গণিতজ্ঞ ব্যক্তিরা জন্মেছিলেন। পৃথিবীই যে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, তা আর্য-ভট্টই পৃথিবীতে প্রথম ঘোষণা করেছিলেন। রসায়নে ভারত যে কতো উন্নত ছিল, তার প্রমাণ তার সুন্দর সুন্দর অলংকার ও অপরূপ মুদ্রাগুলি। দিল্লীর কাছে গুপ্ত যুগে নির্মিত যে লৌহ স্তম্ভটি আছে, তাতে আজও মরচে পড়েনি। এ ধরনের লৌহ প্রস্তুত করার কৌশল যাঁরা জানতেন, তাঁরা রসায়ন-বিদ্যায় যে কতো পারদর্শী ছিলেন, তা কল্পনা করা যায়।
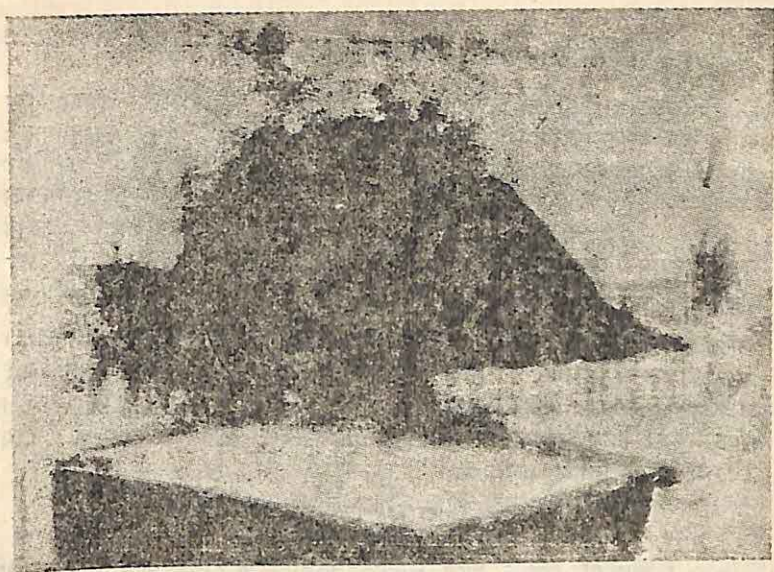
অশোক-নির্মিত সাঁচী স্তূপ
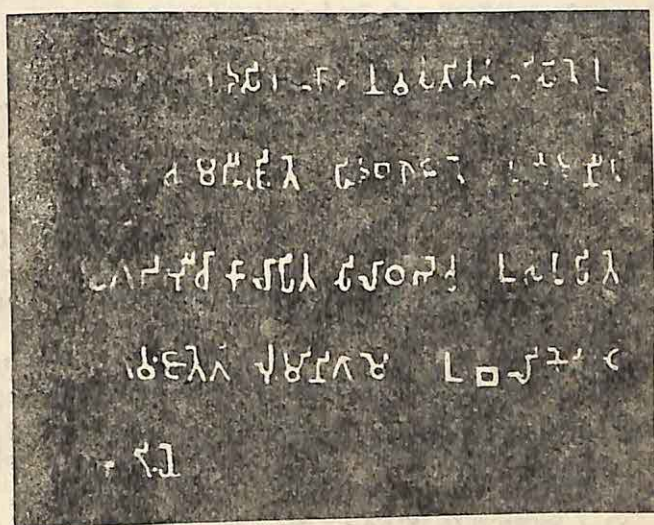
ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত অশোক লিপি

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয়রা চিকিৎসাবিদ্যাতেও খুবই অগ্রসর ছিলেন। ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা আয়ুর্বেদ নামে পরিচিত। প্রাচীনকালের চিকিৎসকদের মধ্যে জীবক, চরক ও সুশ্রুত সর্বাধিক বিখ্যাত।

চরক-সংহিতা আয়ুর্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। প্রাচীন ভারতীয়রা অস্ত্রচিকিৎসাতেও পারদর্শী ছিলেন।

ভারতীয়রা লিপির উদ্ভাবন করেছিলেন। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত সীলমোহরগুলিতে একধরনের লিপি ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়। পরবর্তীকালে ভারতে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপির প্রচলন হয়েছিল। অশোকের অনুশাসনগুলিতে ঐ লিপি ব্যবহৃত হয়েছে। দেশের মানুষ নিশ্চয় লেখাপড়া জানত। নাহলে ঐসব অনুশাসন কার উদ্দেশে লিখিত হয়েছিল? প্রাচীন কালেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য ভারতীয়রা বিশ্ববিদ্যালয় গ'ড়ে তুলে-ছিলেন। বুদ্ধদেবেরও আগে থেকে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যার্থীদের তীর্থস্থান ছিল। গুপ্ত যুগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশিলার স্থান নিয়েছিল। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য ছাত্র এসে পড়াশুনা করত। প্রাচীনকালে আধুনিক কালের মতো বিদ্যালয় ছিল না। ছাত্ররা গুরুগৃহে থেকেই বিদ্যাভ্যাস করত।

অনুশীলনী

১। আর্যরা কোন্ পথে ভারতে এসেছিলেন? ভারতে এসে তাঁরা কাদের সম্মুখীন হয়েছিলেন? এর ফলাফল কি হয়েছিল?

২। বেদ শব্দের অর্থ কি? বেদ ক'টি ও কি কি? প্রত্যেক বেদ ক' ভাগে বিভক্ত? বিভাগগুলি কি কি?

৩। বৈদিক যুগে ভারতীয় আর্যদের সমাজ-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

৪। বৈদিক যুগে আর্যদের ধর্ম কিরূপ ছিল?

৫। মহাকাব্যগুলি থেকে প্রাচীন ভারতের সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে কি চিত্র পাওয়া যায়?

৬। জৈনধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন কে? তাঁর জীবন ও জৈনধর্ম সম্পর্কে যা জান লিখ।

৭। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন কে? তাঁর জীবন ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে যা জান লিখ।

৮। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? তাঁর জীবন সংক্ষেপে বর্ণনা কর। মৌর্য নাম কেন হয়েছিল?

৯। অশোক কে ছিলেন? তিনি কিভাবে সিংহাসন লাভ করে-ছিলেন? তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন কেন? তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য কি করেছিলেন? তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয় কেন?

১০। কণিষ্ক কে ছিলেন? তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার ও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে যা জান লিখ।

১১। সমুদ্রগুপ্ত কে ছিলেন? তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার ও অন্যান্য কর্মাবলী সম্পর্কে কি জান?

১২। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কে ছিলেন? তাঁর কি কি উপাধি ছিল? তাঁর সভাকবি কে ছিলেন? তাঁর সময়ে কোন্ চীনা পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন?

১৩। প্রাচীন বঙ্গদেশ সম্পর্কে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধশাস্ত্র থেকে কি জানা যায়?

১৪। গঙ্গারিডই জাতি সম্পর্কে গ্রীক লেখকরা কি বলেছেন?

১৫। প্রাচীন ভারতের সঙ্গে বিদেশের যোগাযোগ কিরূপ ছিল ? ভারতের বাইরে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার সম্পর্কে কি জান ?

১৬। মেগাস্থিনিস কে ছিলেন ? তাঁর বিবরণ থেকে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে কি জানা যায় ?

১৭। ফা-হিয়েন কে ছিলেন ? তাঁর বিবরণ থেকে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে কি জানা যায় ?

১৮। প্রাচীন ভারতের শিল্প-সাহিত্য ও শিক্ষা সম্পর্কে কি জান ?

১৯। প্রচীন ভারত জ্ঞান-বিজ্ঞানে কিরূপ উন্নত ছিল ?

২০। শূন্য স্থান পূরণ কর : (ক) আর্যরা — পথে ভারতে এসেছিলেন। (খ) মহাবীরের প্রকৃত নাম —। — শব্দ থেকে 'জৈন' শব্দের উৎপত্তি। (গ) বুদ্ধদেবের প্রকৃত নাম —। তিনি — বা পরম জ্ঞান লাভ করায় তাঁর নাম হয় বুদ্ধ। (ঘ) মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত — নন্দকে পরাজিত ক'রে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। (ঙ) অশোককে পৃথিবীর — সম্রাট বলা হয়। (চ) কণিষ্ক জাতিতে ছিলেন। (ছ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত — দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। (জ) গ্রীক লেখকরা বলেছেন, প্রাচীন-কালে বাংলাদেশে — নামে এক পরাক্রান্ত জাতি বাস করত। (ঝ) মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় যে গ্রীক রাজদূত ছিলেন, তাঁর নাম —। (ঞ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক — ভারতে এসেছিলেন। (ট) প্রাচীন রোমান স্বর্ণমুদ্রার অনুকরণে ভারতীয় প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রার নাম হয়েছিল —। (ঠ) সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে, এ কথা প্রথম বলেছিলেন —।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

১। পারসিকদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থের নাম কি ?
২। ভারতীয় আর্যরা প্রথমে কোথায় বসতি স্থাপন করেছিল ?
৩। বেদ শব্দের অর্থ কি ?
৪। বেদের আর এক নাম কি ? এরূপ নাম হওয়ার কারণ কি ?
৫। বৈদিক যুগের দুইজন বিদুষী নারীর নাম লিখ।
৬। বানপ্রস্থ কাকে বলে ?
৭। বৈদিক যুগে গ্রামের প্রধানকে কি বলা হত ?
৮। আর্যদের প্রাচীন দুটি মহাকাব্যের নাম লিখ।
৯। জৈনধর্ম প্রবর্তন করেন কে ?
১০। মহাবীর কত বছর বয়সে কোথায় মারা যান।
১১। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক কে ?
১২। চন্দ্রগুপ্ত কার সাহায্যে সিংহাসন লাভ করেন ?
১৩। "চণ্ডাশোক" কে ছিলেন ?
১৪। কোন্ যুদ্ধের ফলে অশোকের মনে পরিবর্তন আসে ?
১৫। কুষাণদের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম কি ?
১৬। কণিষ্কের সভাকবি কে ছিলেন ?
১৭। সমুদ্রগুপ্তের সভাকবির নাম কি ?
১৮। কে "শকারি" উপাধি গ্রহণ করেন ?
১৯। মহাকবি কালিদাস কার সভাকবি ছিলেন ?
২০। কার সময়ে হূণ জাতি ভারত আক্রমণ করে ?
২১। বিজয়সিংহ কোন্ দেশ জয় করেন ?

২২। দুজন জৈন তীর্থংকরের নাম লিখ।
২৩। পার্শ্বনাথ কোন্ পাহাড়ে দেহত্যাগ করেন?
২৪। কার নামানুসারে পরেশনাথ পর্বত নাম হল?
২৫। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে বাংলাদেশে কোন্ জাতির লোক বাস করত?
২৬। গঙ্গরিডই জাতি যে পরাক্রান্ত ছিল তা' কিভাবে জানা যায়?
২৭। ব্যবসার জন্য মৌর্যযুগে বাংলাদেশের সঙ্গে কোন্ কোন্ দেশের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল?
২৮। "ইণ্ডিকা" কি?
২৯। ইণ্ডিকার রচয়িতার নাম কি?
৩০। মৌর্যযুগে নগর পরিচালনার দায়িত্ব কাদের উপর ন্যস্ত ছিল?
৩১। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে কোন্ পরিব্রাজক ভারতে আসেন?
৩২। ভারতীয় ও গ্রীক শিল্পপদ্ধতির মিলনে কুষাণ যুগে যে শিল্প গড়ে ওঠে তার নাম কি?
৩৩। গুপ্ত যুগের দুইজন নাট্যকারের নাম লিখ।
৩৪। ভারতীয় চিকিৎসা বিদ্যা কি নামে পরিচিত?
৩৫। প্রাচীনকালের দুইজন চিকিৎসকের নাম লিখ।
৩৬। "চরকসংহিতা" কি?
৩৭। প্রাচীন ভারতের ছাত্ররা কোথায় থেকে বিদ্যাভ্যাস করত?

৩৮। শূন্যস্থান পূরণ কর:

ক. বেদের প্রাচীনতম অংশের নাম —। খ. বেদের শেষাংশ — বা —। গ. আর্য ও অনার্যদের মধ্যে পার্থক্য রাখার জন্যে — সৃষ্টি হয়েছিল। ঘ. শ্রমশিল্প ও পরিচর্যাদি হল — কাজ। ঙ. আর্যসমাজে কতকগুলি গ্রাম নিয়ে গঠিত হত — বা —। চ. আর্যসমাজে রাজার প্রধান মন্ত্রীকে বলা হ'ত —। ছ. প্রজাতন্ত্রের প্রধানকে বলা হত —। জ. রামায়ণ রচনা করেন —। ঝ. বেদব্যাস — রচনা করেন। ঞ. জিন শব্দ থেকে — শব্দের উৎপত্তি। ট. শুদ্ধোদনের রাজধানী ছিল —। ঠ. বুদ্ধদেবের বাল্যনাম —। ড. কণিষ্কের মৃত্যুর পর — সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ঢ. সমুদ্রগুপ্ত কেবল বীর ছিলেন না, তিনি — এবং — ছিলেন।

৩৯। সঠিক উত্তর পাশে (√) চিহ্ন দাও:

ক. পার্শ্বনাথ যে পাহাড়ে দেহত্যাগ করেন তার নাম ত্রিকূট, সমেত, বিন্ধ্যাচল। খ. আর্যসমাজে প্রজাতন্ত্রের প্রধানকে বলা হত — রাজন, পুরোহিত, গণজ্যেষ্ঠ। গ. মহাবীরের ধর্মমতে বিশ্বাসীরা পরিচিত ছিল জৈন, শক, হূণ নামে। ঘ. চন্দ্রগুপ্ত যে ব্রাহ্মণের সাহায্যে মগধের সিংহাসন লাভ করেন, তাঁর নাম — নন্দ, চাণক্য, মুরা। ঙ. কণিষ্কের রাজধানীর নাম — বুদ্ধগয়া, কলিঙ্গ, পুরুষপুর। চ. কণিষ্কের সভাকবির নাম — সেলুকস, হরিষেণ, অশ্বঘোষ। ছ. গুপ্তযুগের একজন শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ হলেন — জীবক, পাণিনি, আর্যভট্ট। জ. আয়ুর্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম — চরকসংহিতা, অমরকোষ, ইণ্ডিকা।

———